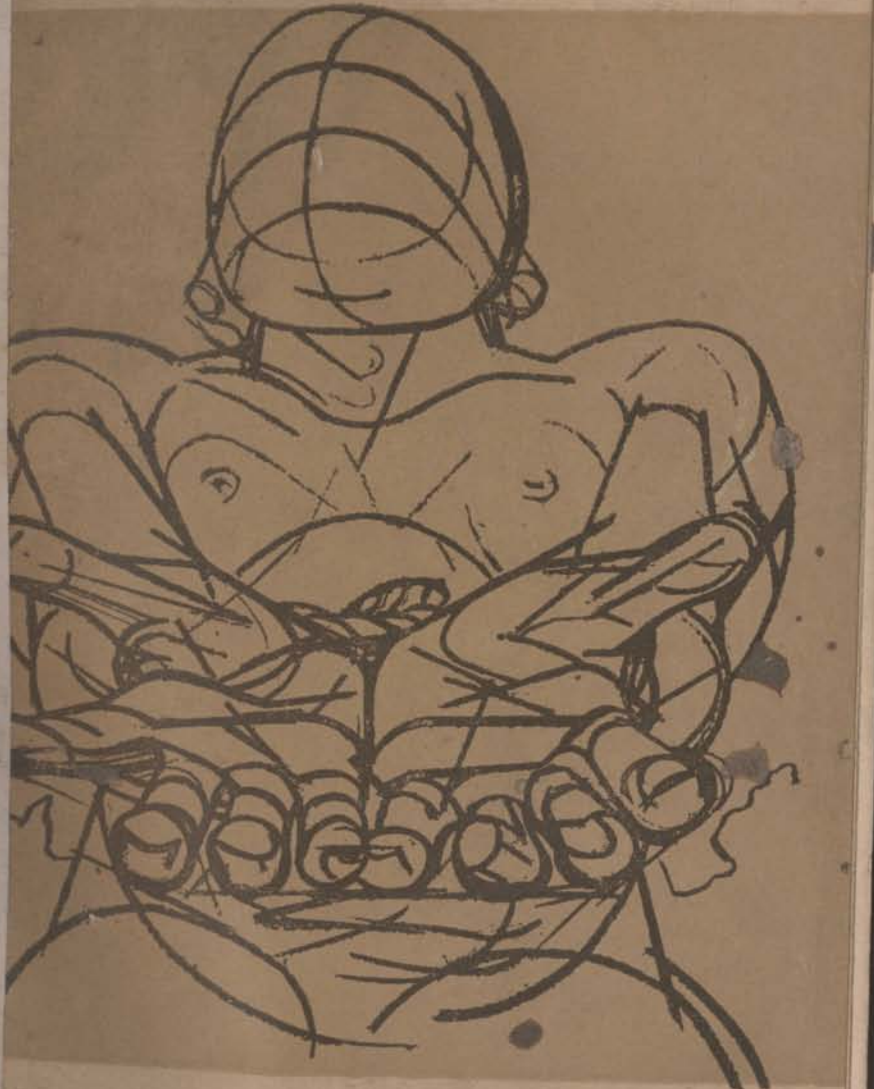


দাম : এক টাকা

পরিচয়



চৈত্র ১৩৬৮

সূ চী প ত্র

চৈত্র ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



৪ঠা মে পতাকা দিবস



মুক্ত হস্তে দান করিয়া আর্তের সেবায়
সহায়তা করুন।

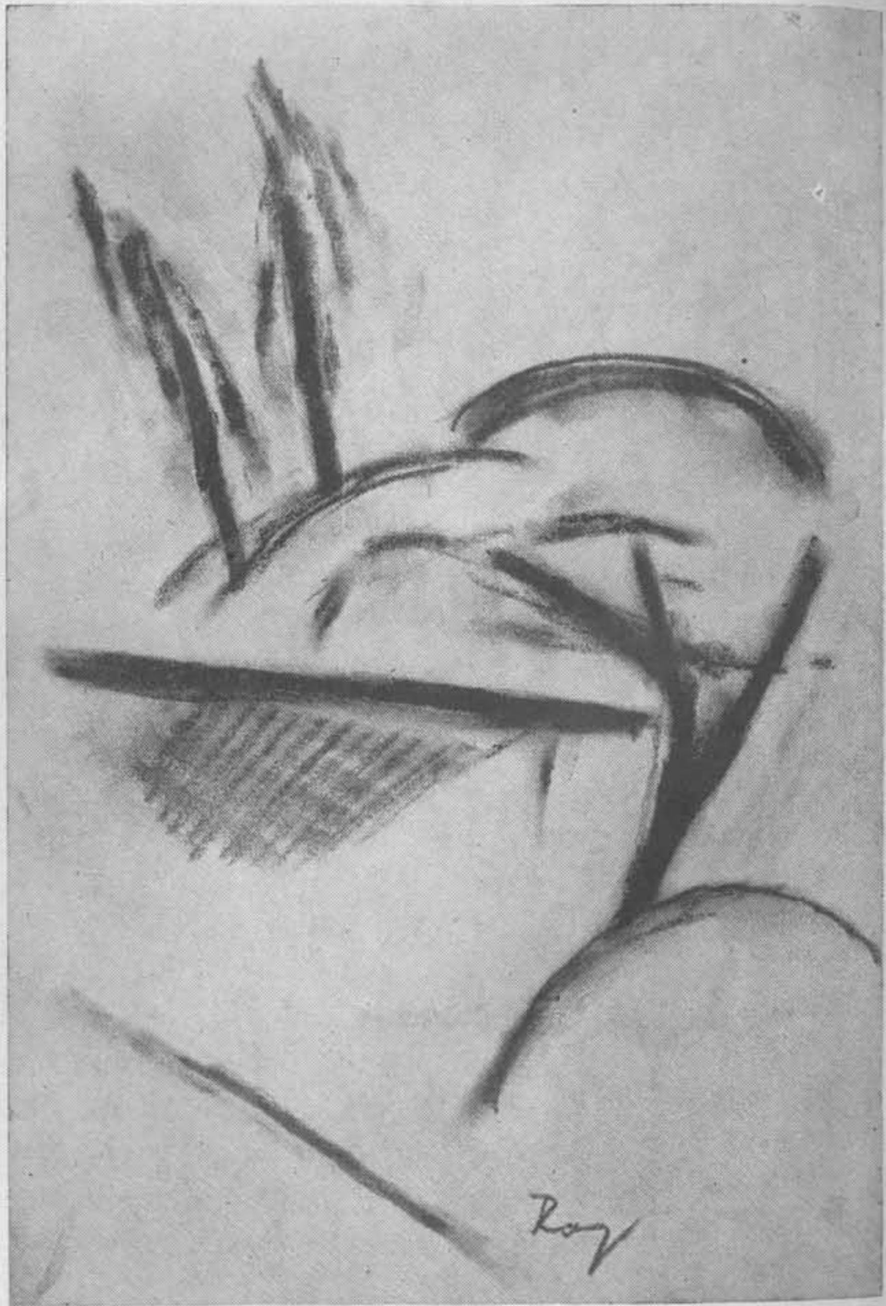
সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড (ভারত)

২নং পশ্চিমবঙ্গ শাখা

হেডকোয়ার্টার

৫, গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ। কলকাতা

টেলিফোন ২৩-৫২৭৭



ল্যাণ্ডস্কেপ দেবকুমার রায়চৌধুরী

বোদল্যার এবং বোদল্যার-কাব্যের অনুবাদ

অরুণ মিত্র

আত্ম-দর্শনেই বোদল্যার[১]-এর শ্রেষ্ঠতা এবং বোদল্যার-এর শোচনীয়তা। তাঁর আগে এমন ক'রে কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হননি। কবিদের মধ্যে তিনিই যে প্রথম নিজের দিকে তাকালেন এমন নয়, অনেকেই তাকিয়েছিলেন, বিশেষত অব্যবহিত পূর্বের কবিরা। বস্তুত তাঁদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর সাদৃশ্য যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর মতো অনুসন্ধান তাঁদের ছিল না। আত্মকেন্দ্রিত দৃষ্টির পথে তিনি পৃথিবীর মুখ দেখার চেষ্টা করেন। কে আর এত একাগ্র চেতনায় দুই জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন? অন্তরের রাজ্যে বোদল্যার-এর অন্বেষা ছিল যেমন সচেতন তেমন ক্লান্তিহীন। আবিষ্কারীর মতো। যে অন্ধকার অতলে নামতে ভয় করে, সেখানে নেমে তিনি তাঁর মানুষী প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করেন এবং তাতে সব মানুষের প্রতিফলন দেখেন। এই স্বরূপ-উদ্ঘাটন কবিতার মাধ্যমে, অতএব কবিতায় তিনি তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই নিযুক্ত করেন। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, কবিতা এবং জীবন তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কবিতার এই নিরবচ্ছিন্ন একান্ত জীবন-সংযোগের রূপ বোদল্যারেই আমরা প্রথম পেলাম। তিনিই দেখালেন, কবিতা রচনা এবং কবিতা ও জীবন সম্বন্ধে ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। এক নতুন আদর্শ পরবর্তী কবিদের সামনে স্থাপিত হলো। কবিতা যে এক উচ্চতম বৃত্তি এবং তার সঙ্গে যে অন্য কিছুর বিনিময়

১। বোদল্যার লেখাই ভালো। 'বোদলেয়ার' লিখলে শেষে দুটো স্বরধ্বনি আসে : এ এবং আ। কিন্তু ফরাসী উচ্চারণে মাত্র একটা ধ্বনি। অ্যা ধ্বনিকে একটু দীর্ঘ ক'রে বললে অনেকটা ঠিক হয়।

চলে না, এই ধারণা তিনি তাঁর চিন্তা ও জীবন দ্বারা সঞ্চারিত করেন। অর্থ, যশ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন; কবিতার প্রতি আনুগত্য বৈষয়িক আসক্তিকে তাঁর মনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়নি। যেহেতু কাব্য তাঁর কাছে খেলার বিষয় ছিল না, সেহেতু তার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। শব্দের মূল্য, প্রয়োগের যাথার্থ্য, ছন্দ, মিল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও পরিশ্রমের শেষ ছিল না। এও কবিকর্মীদের সামনে এক নতুন দৃষ্টান্ত।

বোদল্যার-এর কবি-স্বভাবে প্রধান প্রেরণা ইন্দ্রিয়ানুভূতির। তারই স্পর্শে চোখ খুলে তিনি নিজের ভিতরে তাকিয়েছেন। পৃথিবী তাঁর মধ্যে যে অনুরণন জাগিয়েছে তাও যেন তাঁর স্নায়ুরই অনুরণন। তাঁর কল্পনা হৃদয়োচ্ছ্বাসকে অবলম্বন ক'রে বিস্তৃত হয়নি। তিনি মূলত অনুভবের কবি। ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রখর ক'রে তিনি সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জীবনের রহস্য অনুসরণ করেছেন। অনুভব-আশ্রয়ী কবিতার অন্যতম উদ্গাতা তিনি। শুধু তাই নয়, স্বপ্নপ্রয়াণে, অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের উন্মোচনে এবং ভাষার যাদুকরী ক্ষমতার অনুধ্যানে তিনি কবি-শিল্পীর এক নতুন ভূমিকার ইঙ্গিত দেন। বাহ্য জগৎকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করার কথাও এই সঙ্গে তিনি বলেন। বস্তুপুঞ্জ এক গোপন সত্যের ব্যঞ্জনামাত্র, বর্ণ গন্ধ ধ্বনির মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই, তারা এক আইডিয়ারই সঙ্কেত এবং কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার ক'রে অন্তরালবর্তী সত্যিকার জগৎকে উন্মোচিত করবে, এই তাঁর বক্তব্য। অবশ্য এ-সব বোদল্যার-এর মৌলিক কোনো চিন্তা নয়। একাধিক পূর্বগামীর চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি কাব্য-ভাবনায় তা গ্রহণ ক'রে এবং কবির জীবন ও আচরণের সঙ্গে তা যুক্ত ক'রে এক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেন। দ্রষ্টার ভূমিকার জন্যে আকুল র‍্যাঁবোর পক্ষে তাই বোদল্যারকে "প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, এক সত্যিকার দেবতা" ব'লে উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

অতএব বিভিন্ন দিক থেকে বোদল্যার আগামী কাব্যের এক উৎসস্থল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সব রকম নতুন কাব্য-প্রয়াসের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি রেখে যান। বরং উল্টে এই কথাই বলা যায় যে, তাঁর সৃষ্টির সঙ্কীর্ণ মানস-পরিসরে ওরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভবই ছিল না। তাঁকে পথপ্রদর্শক এই হিসেবে ধরা যায় যে, তাঁর চিন্তায় ও চেষ্টায় এমন কিছু

কিছু বীজ ছিটিয়ে ছিল যা পরে বিভিন্ন কবিকর্মী আহরণ ক'রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বপন করেন এবং সযত্নে বড় ক'রে তোলেন। যে-সব মহীরুহ আকার নেয়, বোদল্যার নিশ্চয়ই তাদের কল্পনা করেননি। ভেরলেন, র‍্যাঁবো, মালার্মে এবং আরও পরে ভালেরি ও স্যুররেয়ালিস্টরা তাঁর কাছ থেকে যে প্রেরণাই পেয়ে থাকুন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান বিস্তর। তবু বোদল্যার কাব্যের নতুন পর্বের অর্থাৎ আধুনিক কাব্য ব'লে যাকে অভিহিত করা হয় তার প্রারম্ভ-সীমা। সেদিক থেকে তাঁর গুরুত্ব ঐতিহাসিক।

বোদল্যার নিজের অন্তরে অবগাহন ক'রে যে মানুষটিকে দেখেছিলেন এবং যার মুখের আদলে অন্য মানুষদের মুখ মিলিয়েছিলেন, সে মানুষটি কিন্তু অসুস্থ। অবশ্য অংশত সে অসুস্থতা নতুন যুগের এক-নাগরিক অসুস্থতা। যুগের ছাপ তাতে আছেই। কিন্তু এও ঠিক যে, মানুষ বোদল্যার শরীরে ও মনে অসুস্থ ছিলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর স্নায়ু পীড়িত এবং তাঁর মন পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে তিক্ত ও অস্থির। পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় এরা আরও জর্জর হয়েছে। অনিয়মে ও ব্যাধির আক্রমণে শরীর ভেঙে পড়েছে। মন নানান উদ্ভাবনে বার বার উদ্ধার খুঁজেছে, আর ব্যর্থ হয়ে শুরু করেছে আত্মনিগ্রহ অথবা এক সঙ্কীর্ণ বিদ্রোহ। তাঁর বাক্যে ও বেশভূষায় অন্যকে বিস্মিত করবার, সন্ত্রস্ত করবার যে প্রবণতা দেখা যেত, তা অংশত এই বিদ্রোহের একটা প্রকাশ মনে হয়। কবি ব'লে তাঁর মধ্যে স্বভাবগত উদ্দীপনা ছিল; কিন্তু তারই সঙ্গে উল্টোপিঠে ছিল এমন এক জীবন-বিমুখতা যা স্বাভাবিক নয়। "শৈশবেই আমার হৃদয়ে আমি দুই বিরুদ্ধ ভাব অনুভব করেছি: জীবনের বিভীষিকা এবং জীবনের উন্মাদনা। বিচলিত-স্নায়ু নিষ্কর্মার চরিত্র এটা।"—এ তাঁর নিজেরই কথা। শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিকতা যেন তাঁর এক বিলাসেই দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে তাঁর ডায়েরীতে তিনি লেখেন: "আমার হিস্টিরিয়াকে আমি উপভোগের সঙ্গে এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে বর্ধিত করেছি।"

তাঁর কবি-সত্তা অবশ্যই স্বপ্নের জগতে উত্তরণ চেয়েছে। তাঁর অলস উপভোগ-বাসনার সঙ্গে সমঞ্জস এক আশ্চর্য দেশের কল্পনা তিনি করেছেন। সুন্দরকে অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, জীবন তাঁকে শূন্যতার বোধই দিয়েছে। তাঁর মনের ভিতরকার বিভীষিকা ও নৈরাশ্য তাঁকে আরও বেশি চেপে ধরেছে। তিনি জীবনের রহস্য সন্ধানে বেরিয়ে নিজের অন্তরে এবং

মানুষের অন্তরে দেখেছেন পাপের রাজত্ব। দেখেছেন, শয়তান সুতো ধ'রে আমাদের সকলকে নাচাচ্ছে। আদি পাপের বোধে তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল, অথচ শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা তিনি দেখেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি পাপের আলিঙ্গনে নিজেকে আরও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে আলিঙ্গনের মধ্যে জ্ঞান হারাতে চেয়েও তিনি জ্ঞান হারাননি। বোধলুপ্তি তাঁর কখনও ঘটেনি। অনুভূতির পাশাপাশি অপ্রমত্ত বুদ্ধি সব সময়ই তাঁর মধ্যে বাস করেছে। বিকৃত অস্তিত্বের দৃশ্য বার বার তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে এসেছে। প্যারিসের নগর-জীবনের যে অংশ কাতর, মলিন, বিকৃত, তা স্বভাবতই তাঁর সৃষ্টির একটা পটভূমি হয়েছিল। এ রকমভাবে বাঁচলে এক ধরনের মানসিক অকাল-বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী (পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি শরীরেও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন)। তাঁর কবিতায় তাই পড়ি: "আমি এক বর্ষণ-ক্লিষ্ট দেশের রাজা, ধনী কিন্তু ক্ষমতাহীন, যুবক তবু অত্যন্ত বৃদ্ধ।" (Spleen-৩)

অতএব জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আসা অস্বাভাবিক নয়, বরং অনিবার্য। এই বিতৃষ্ণা তাঁর কাব্যে ওতপ্রোত। এ এক শোচনীয় মানসিক অবস্থা যা তিনি তাঁর কাব্যে অসাধারণ ক্ষমতায় চিত্রিত করেছেন। অনীহা ও বিষাদ তাতে অবশ্যই আছে, কিন্তু তিক্ততাও আছে। এবং উগ্রতা তা থেকে দূরে নয়। তাঁর 'Ennui'-র ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় তাঁর 'Spleen', যাকে একজন ফরাসী সমালোচক "নিশ্চল উগ্রতা" ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁর নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভের অবস্থান পাশাপাশি।

বোদল্যার-এর ট্র্যাজিডি হলো এই যে, এ অবস্থা থেকে তিনি নানা উপায়ে উদ্ধার পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। প্রণয় ও যৌনতা, নেশা ও স্বপ্ন (আমার মনে হয়, এমনকি তাঁর ভড়ংগুলোও) যেন তাঁর অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলাকে ভুলবার চেষ্টা। তাঁর জীবনযাত্রায় ও কাব্যে এ চেষ্টার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। তিনি সফল হননি, কারণ তাঁর বুদ্ধি ও চেতনাকে তিনি ঘুম পাড়াতে পারেননি। La Fontaine du Sang কবিতায় তার স্বীকৃতি অকপট। ঘুরেফিরে তিনি নিজের অস্তিত্বের দৈন্যকে দেখেছেন, যাকে মানুষেরই অস্তিত্বের রূপ ব'লে তাঁর মনে হয়েছে। পরিচিত পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন: "যেখানে হোক, যেখানে হোক, এই পৃথিবীর বাইরে।" অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে অস্থির হয়েছেন। অবশেষে

সতৃষ্ণভাবে তাকিয়েছেন মৃত্যুর দিকে: "হায় মৃত্যুই সান্ত্বনা, সে-ই বাঁচায়। সে-ই হল জীবনের লক্ষ্য।" (La Mort des Pauvres)। তাঁর কাব্যে মৃত্যু এক আচ্ছন্নতার মতো বিরাজমান। কিন্তু মৃত্যুর বিস্ময় তাঁকে আকৃষ্ট করলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বিস্ময় থাকে না। কল্পনায় তার পরেও নিজের চেতনা ও মূর্তি জেগে থাকে। এই চরম দুর্ভাগ্যের অভিব্যক্তি Le Rêve d'un Curieux। এর পরে আর কি থাকতে পারে, ঘুরে ফিরে সেই জীবনের গহ্বরে মাথা কোটা ছাড়া?

বোদল্যার-কাব্যে মহত্ত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তা অন্য এক নতুন জীবনের জন্যে কবির আকাঙ্ক্ষায় নিহিত। যদিও এ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি কিছু নেই, তবু তার একটা ধ্বনি আছে তাঁর কাব্যে। শিল্পের শ্রেষ্ঠতা স্মরণ এবং শিল্পের মাধ্যমে এক অসামঞ্জস্যবিনাশী রহস্যময় ঐক্যে উপনীত হওয়ার কল্পনা তার সঙ্গে যুক্ত। বাঁচবার জন্যে তাঁর প্রয়াসের সেই চিহ্নও ইতস্তত কিছু আছে। আর আছে কয়েকটি কবিতার বিধুর গাম্ভীর্যে এক ক্ষণিক প্রশান্তির স্বর। ঐটুকুই আলো। নইলে তাঁর কাব্যের আবহাওয়ায় হাঁপ ধ'রে আসে। গহ্বর ও কারাগারের অস্তিত্ব সেখানে সর্বব্যাপী। পাপবোধে, শয়তানের লীলায়, যৌনতা-জড়িত বিক্ষেপে, অবসাদে, বিতৃষ্ণায় এবং এক মুক্তিহীন বিকারগ্রস্ততায় জীবনের রূপ সেখানে অভিভূত। তা ছাড়া তাঁর কাব্যে পরিসরের স্বল্পতা এবং পুনরাবৃত্তি ক্লান্তিও আনে। কিন্তু তাঁর কবি-শক্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। পরন্তু তাঁর শক্তির কারণেই তাঁর সৃষ্টি আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এক যন্ত্রণা-জর্জর মানুষকে প্রত্যক্ষ ক'রে যন্ত্রণা পাই। নিজের প্রতিরূপে যে মানুষকে তিনি এঁকেছেন, সে সম্ভোগ ও বিতৃষ্ণায় সদাবিক্ষিপ্ত, ঈশ্বরে উন্মুখ হয়েও শয়তানের দ্বারা কবলিত। এ রূপ একটা অবস্থায় সত্য হলেও হতে পারে, কিন্তু বোদল্যার তাকে অনারোগ্য এবং ভবিষ্যৎহীন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিকতার আদি কবির চোখে এই মানুষ। কিন্তু সে নিশ্চয় অবক্ষয়ের মানুষ। সেই মানুষকে তিনি বিসূচিকা-রোগীর অন্তিম চেতনার মতো প্রখর চেতনা নিয়ে এঁকেছেন এবং সেটাকেই জীবনের রূপ ভেবেছেন। তাঁর এই চেতনায় আশ্চর্য না হয়ে আমরা পারি না। কিন্তু জীবনের রূপ?

বোদল্যার-কাব্য সাধারণভাবে আজ আমাদের ভাবনা-সংলগ্ন হতে পারে না। মানুষের সত্তা অপ্রতিকার্যভাবে দূষিত, এই উপলব্ধি তার ভিত্তি এবং

গহ্বর ও শূন্যতার অনুভব তার আধার। এ উপলব্ধি ও অনুভবকে সম্বল ক'রে বাঁচা মানে না বাঁচা। (বোদল্যার আরও বাঁচলে তাঁর কাছে কবিতা লেখারই কোনো অর্থ কি আর বেশিদিন থাকত?) জীবনের দারুণ অস্থৈর্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আজ জীবনের আগ্রহ কম প্রবল নয়। তার উদ্যমও। বোদল্যার-এর আত্মপীড়িত পরিক্রমায় আমাদের উচ্ছলতা দূরে থাক যন্ত্রণারও প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাব না। কিন্তু ইতিহাসের পটে সাহিত্যের বিবর্তনে এ কাব্যের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের অবশ্যই উচিত। শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রায় সম্পূর্ণ বোদল্যার-কাব্য (পদ্য) বাংলায় অনুবাদ ক'রে সেই পরিচয় ঘটালেন। এজন্যে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। তবে বোদল্যার সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিকোণ পৃথক। স্পষ্টতই তিনি বোদল্যার-এর একান্ত ভক্ত। তাঁর ভূমিকা পড়লে মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত কাব্যে বোদল্যার যেন উচ্চতম শিখর, যেন তা আমাদের সামনে এক চূড়ান্ত আদর্শ। এই কাব্যে যা কিছু লক্ষণ আছে সবই যে সাহিত্যের মহালক্ষণ তা বোঝানোর জন্যে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক শ' বছর আগেকার অবক্ষয়-ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা কি সম্ভব? তবে এটা বলা উচিত যে বোদল্যার-এর নিঃশর্ত প্রশস্তিতে বুদ্ধদেব বসু একক নন। নানা দেশের নানা সমালোচক তাঁর সঙ্গী। ভূমিকায় বোদল্যার ছাড়াও অন্য লেখকদের বিষয়ে এমন মন্তব্য আছে যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। যেমন, লা ফঁতেন সম্বন্ধে মন্তব্য। তাঁকে কি অত সহজেই বালক র‍্যাঁবোর জবানিতে অকবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায়? লা ফঁতেন-এর 'লিরিসম্' যাকে বলা হয় তা কি একেবারেই ভুয়ো? তিন শ' বছর আগে যিনি এক আধুনিক ছন্দের সূচনা করেছিলেন, তাঁর শিল্পী-ক্ষমতা কি সাহিত্য-বিচারে খুব তুচ্ছ? আসলে বুদ্ধদেব বসু বলতে চান রোমান্টিক যুগের আগে ফ্রান্সে সত্যিকার কোনো কবিতাই লেখা হয়নি। মনে হয়, তিনি যেন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কাব্যকলা ও কাব্যভাবনা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রত্যাশা করেন এবং তা না পাওয়ায় তিনি বিরক্ত। যাক, এ সব ভিন্ন প্রসঙ্গ। বোদল্যারই বিবেচ্য।

বোদল্যার-এর বাস্তব উপস্থিতি তাঁর কবিতায়। সেটাই পাঠকদের কাছে সব চেয়ে বড় সত্য। তা থেকে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। উপলব্ধি, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। আনন্দের কথা এই যে, বুদ্ধদেব বসু

বোদল্যার-এর উপস্থিতিকে বাঙালী পাঠকের ইন্দ্রিয়গোচর করলেন এবং বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখাকে পুষ্ট ক'রে বাঙালী সাহিত্য-অনুসন্ধিৎসুর জানার সীমানা বাড়িয়ে দিলেন। বোদল্যার-এর এতগুলি কবিতা (১০৮টি) অনুবাদ করতে যে সময় ও পরিশ্রম তাঁকে নিয়োজিত করতে হয়েছে, তা সামান্য নয়। শুধু কবিতার অনুবাদই তিনি করেননি, বোদল্যার-এর জীবন ও কাল সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে লিখেছেন এবং বিভিন্ন কবিতার টীকা করেছেন। এই উদ্যম অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

দুই

কবিতার অনুবাদ দুরূহ কাজ। তার সমস্যা অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ রূপ নিয়ে, যারা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মূল কবিতার বক্তব্য অবিকৃত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব তার আবহাওয়াও। সেই সঙ্গে তার গঠন এবং ভাষার বৈশিষ্ট্যকেও বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই সব বিষয়ে অবহিত থেকে কবিতার ভাষান্তর করলে তবে অনুবাদ সার্থক হ'তে পারে, অর্থাৎ মূলের একটা আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে। এ কাজ কবি ছাড়া অন্যের দ্বারা সম্ভব মনে হয় না। কারণ শিল্পগত দক্ষতার প্রশ্ন তো আছেই, তা ছাড়াও আছে হৃদয়গত সহানুভূতির প্রশ্ন। যে কবিতা অনুবাদ করব তার ভিতরে বাস করা দরকার, সাময়িকভাবে তার হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া দরকার। যে কোনো অনুবাদেই এ প্রশ্ন আসে। আর সমগ্রভাবে কোনো কবিকে অনুবাদ করতে গেলে তো কথাই নেই। এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু বোদল্যার-অনুবাদে স্বাভাবিকভাবে অধিকারী, বিশেষত যে কবির প্রতি তিনি অমন পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধাবান।

ভাষার বদল ঘটাতে হয় ব'লে মূলের গঠন অনুবাদের এক দারুণ সমস্যা। এ সমস্যা মোটামুটিভাবে সমাধান করা ছাড়া উপায় নেই। ছন্দ ও মিল যেখানে আছে, যেমন বোদল্যারে আছে, সেখানে ছন্দ ও মিল রাখতেই হবে; কিন্তু মূলের ছন্দ ও মিল রাখার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ সে অন্য ভাষা। কেবল ছকটা রাখাই এ ক্ষেত্রে কর্তব্য, যাতে মূলের গঠনের একটা আভাষ পাওয়া যায়। মূল ছন্দের একটা চলন যেন নিশ্বাসের আন্দাজেই রাখতে হবে। এবং মিলের ক্রমটা। ছন্দ ও মিল দিয়ে লিখতে গেলে মূলের কিছু শব্দ অন্য ভাষায় প্রতিশব্দ থাকলেও বাদ পড়বে এবং নতুন শব্দ কিছু

বসবে। এ এড়ানো যাবে না। এ অবস্থায় কবিতার চরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যাতে বাদ না যায় এবং কবি-চরিত্রের সঙ্গে অসমঞ্জস কোনো ভাষাভঙ্গী না আসে, এই সাবধানতাটুকু প্রয়োজন। ধ্বনির সমস্যাও আছে। কিন্তু এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষায় আর কি ক'রে আনা যাবে? মোটের উপর এই করতে পারি যে, গম্ভীর ধ্বনিকে ভাষান্তরে গম্ভীরই রাখব এবং লঘু ধ্বনিকে লঘু। এ বিষয়ে যথেচ্ছ আচরণ করব না। বলা বাহুল্য, শব্দ, মিল ও ছন্দ মিলিয়েই এই ধ্বনি। কবিতা বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে আর এক ধরনের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। বাক্যের ব্যাকরণগত অর্থ অনেক সময় স্পষ্ট না হওয়ায় অনুবাদ প্রধানত নির্ভর করে ভাষ্যের উপর। অর্থাৎ অনুবাদক কবিতার কি ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করছেন তার উপর। কিন্তু বোদল্যার-এর ক্ষেত্রে এ অসুবিধে নেই। কারণ বিশেষ কোনো শব্দের সংস্থাপন, চিত্রকল্প এবং ভাব তাঁর কবিতায় যে রহস্যই সঞ্চার করুক না কেন, বাক্যের গঠন তা থেকে মুক্ত। তাঁর কাব্যে এমন জায়গা খুব কমই আছে, যেখানে ব্যাকরণগতভাবে তাঁর বাক্যের অর্থ করতে ক্লেশ হয়।

ভাষান্তরে অনেক সময়ই কবিতা আর কবিতা থাকে না, কতকগুলো শব্দের সমষ্টিতে দাঁড়ায়। বোঝা যায়, তা নেহাৎ অনুবাদ। বোদল্যার-অনুবাদে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব এই যে, এতগুলি কবিতার তিনি পাঠযোগ্য রূপান্তর ঘটিয়েছেন। অনেক অনুবাদই কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। কিন্তু সেটাই সব নয়, এমন কি আসলও নয়। মূলের বৈশিষ্ট্য কতখানি থাকল, সে প্রশ্ন একান্তভাবে বিবেচ্য। কিছু অনুবাদ বাস্তবিকই ভালো। সেগুলিতে যেন মূল কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়, ধ্বনিতে এবং ভাবে। যেমন, 'পণ্য কবিতা', 'শত্রু', 'সৌন্দর্য', 'সপ্রাণ মশাল', 'আধ্যাত্মিক উষা', 'বিতৃষ্ণা', 'আবেশ', 'এখনো ভুলিনি তাকে', 'মহাপ্রাণ সেই দাসী', 'পাতকিনী', 'সিথেরায় যাত্রা', 'শিল্পীদের মৃত্যু', 'গহ্বর' প্রভৃতি কবিতা। অবশ্য অনুবাদ ভালো হলেও কোনো কোনো জায়গায় মন সায় দেয় না, এমন হয়। কোথাও কোথাও পরিবর্তন হ'লে সর্বাংশে সুন্দর হতো মনে হয়। কিন্তু এ মনে-হওয়াটা গুরুতর নয়। কোনো অনুবাদই বোধহয় অন্যের আশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে না। এ গ্রন্থে এমন অনুবাদও আছে যা সমগ্রভাবে আকৃষ্ট না করলেও কোনো কোনো অংশে প্রশংসনীয়।

কিন্তু ব্যর্থ অনুবাদও যথেষ্ট। বোদল্যার-এর অনুবাদ সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে আমরা বাধ্য। যথা, বোদল্যার শব্দের যাথার্থ্যকে অসাধারণ মূল্য দিতেন; ছন্দ ও মিলের গুরুত্বও তাঁর কাছে অসামান্য; তাঁর রচনা পরিষ্কার, বাক্যের গঠনে তাঁর বিন্দুমাত্র শিথিলতা নেই এবং প্রায়ই তা গদ্যসুলভ; তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে 'কাব্যিকতা' নেই; পাঠকের অনুভূতির কাছে তাঁর কবিতার যে আবেদন তার অন্যতম নির্ভর বিশিষ্ট চিত্রকল্পে; এবং এ সবকে অবলম্বন ক'রে তাঁর নিরুচ্ছ্বাস আবেগ তাঁর কবিতায় এক অদ্ভুত তীব্রতা সঞ্চার করে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই এ সব বিষয় বিবেচনা করা হয়নি।

যেমন ধরা যাক, প্রথম কবিতা 'পাঠকের প্রতি'। মূল কবিতা সনাতন ফরাসী ছন্দ 'আলেক্সাঁদ্রাঁ্যা'-তে, অর্থাৎ মোট বারোটি স্বরধ্বনির এক একটি ছত্র। এই সনাতন ছন্দ বোদল্যার-এর অতি প্রিয়। এ ছন্দকে বাংলায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছত্রের অক্ষরবৃত্তে রূপান্তরিত করাই বাঞ্ছনীয়। এবং বুদ্ধদেব বসু বহু কবিতায় তাই-ই করেছেন। কিন্তু এ কবিতায় করেননি। হ্রস্ব ছত্রের মাত্রাবৃত্তে মূলের চলনই নেই এবং শব্দের কায়দায় এ কবিতা প্রায় মৌলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। "জঘন্য সব বস্তু আমাদের কাছে আকর্ষণীয়", এই সরল বাক্যকে যদি করা হয় "বীভৎসে বাঁধি রমণীয় নির্বন্ধে", তাহলে কাব্যিক হয় বটে, কিন্তু বোদল্যারকে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এ কবিতাটি পড়লে মনে হয় যেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তীয় কোনো আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ছি। ছন্দ বহু কবিতায় এই রকম পাল্টানো হয়েছে। যদি মূলের কোনো ছন্দকে বাংলায় একটা বিশেষ ছন্দে ঢালি, তাহলে সেই মূল ছন্দ যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই সেই বাংলা ছন্দ ব্যবহার করা কর্তব্য। নইলে মূল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তার মেজাজও ধরা যায় না।

আমার বিশ্বাস, অনুবাদে ব্যর্থতা যা ঘটেছে, তার কারণ প্রকৃত সহানুভূতির অভাব। নইলে মূল ছন্দের গতিকে বাতিল করা হবে কেন, কেনই বা চিত্রকল্প পাল্টে দেওয়া হবে অথবা ঋজু উক্তিকে ভাষার কৃত্রিমতায় দুর্বোধ্য ক'রে তোলা হবে? এ সবের ফলে অনেক কবিতা বোদল্যারীয় চারিত্র্য পায়নি। যেমন, Léthé-র রূপান্তর কি মূলের তীব্রতাকে একটুও আভাষিত করে? "শুধু তোর শয়ন-'পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয় / খোলা

ঐ খন্দে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে ;" কিম্বা "নিয়তির চাকায় বাঁধা নিরুপায় বাধ্য আমি, / নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানীং ফুল্ল মালা ;" (লিখি)—এ রকম প্রকাশভঙ্গী বোদল্যার থেকে সুদূর এবং কথাগুলো মূলের বক্তব্যও যথাযথ বহন করেনি। ইমেজ নষ্ট ক'রে দিলে কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য কতখানি অবশিষ্ট থাকে ? "এই হৃদয়ের ডুবে মরার অতল হ্রদ…/এগিয়ে মাথা ঝাঁপিয়ে পড়ি,/স্বপ্ন মেটে, দীর্ঘশ্বাসের দেনাও রদ।" (কয়েকটি বিষ)—ঈপ্সিতা রমণীর চোখ সম্পর্কে এই ছত্রগুলো প'ড়ে কি আন্দাজ করা যায়, বোদল্যার বলেছেন : Lacs où mon âme tremble et se voit à l'envers…/ Mes songes viennent en foule/Pour se désalterer à ces gouffres amers. [হ্রদ যেখানে আমার আত্মা কাঁপে এবং নিজেকে উল্টো দেখে…ঐ তিক্ত[1] গহ্বরে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে আমার স্বপ্নেরা ভিড় করে আসে"] ?

অনুবাদ যদি মূলের শব্দ, বাক্যভঙ্গী, এমনকি উক্তিকেও অনুমান করতে না দেয় তাহলে অনুবাদের সার্থকতা কি ? দুয়ের মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিভেদ নানা জায়গায় আছে। যদি bistré comme la peau d'un bonze [বৌদ্ধ ভিক্ষুর ত্বকের মতো খয়েরী]-কে করা হয় "বৌদ্ধের মতো স্বপ্ন ভরা" (একটি মুখের প্রতিশ্রুতি) কিম্বা…à quoi bon chercher tes beautés langoureuses/Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux ? [তোমার প্রিয় শরীরে এবং তোমার মধুর হৃদয়ে ছাড়া অন্যত্র তোমার মদালস সৌন্দর্যকে খুঁজে লাভ কি ?]-কে করা হয় "আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে / যদি না তোমার প্রাণ সুন্দর তনুতে রয় গাঁথা ?" (বারান্দা) কিম্বা Et qui…préférerait / La douleur à la mort et l'enfer au néant. [যারা মৃত্যুর চেয়ে যন্ত্রণাকে বরণীয় মনে করবে এবং শূন্যতার চেয়ে নরককে।]-কে করা হয় "শূন্যতার যে কোনো অন্যথা খুঁজে সর্বস্বান্ত যারা / হোক তা যাতনা মৃত্যু নরকের অনন্ত পাতাল।" (জুয়ো), তাহলে বিস্মিত না হ'য়ে উপায় কি ? "হে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার"

১। আক্ষরিক অর্থ : তিক্ত। ব্যঞ্জনা অনুসারে 'লবণাক্ত' বা অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দ দেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের বিশেষণ হিসেবে ফরাসীতে অনেক সময় উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

(স্তোত্র) শুনতে বেশ সুন্দর, কাব্যময়ও বটে ; কিন্তু বোদল্যার ওরকম-ভাবে মোটেই বলেননি, তিনি সোজাসুজি, প্রায় সাধারণভাবেই বলেছেন : "যে আমার হৃদয়কে আলোয় পূর্ণ করে"।

কবিতার অনুবাদে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন এবং নানা গ্রহণ ও বর্জন অনিবার্য। কিন্তু এমন পরিবর্তন অনুচিত যার ফলে মূলের চারিত্র্য লুপ্ত হয়। পরিবর্তন সত্ত্বেও যে অনুবাদ বিশ্বস্ত হতে পারে, বুদ্ধদেব বসুই একাধিক জায়গায় তার নিদর্শন রেখেছেন। সব পরিবর্তন সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলে খুশী হওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তিনি প্রায়শ যে ধরনের স্বাধীনতা নিয়েছেন তাতে মনে এই সন্দেহ আসে যে, বাস্তবিক যথেষ্ট মমতা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বোদল্যার-এর কাছে যাননি। অবশ্য গোড়াতেই অনুবাদকের মন্তব্য পড়তে গিয়ে একটা খট্‌কা লাগে। তিনি বলেছেন, "এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষায় আমি যতটা অভ্যস্ত ফরাশিতে ঠিক ততটা হলেও, আমার এই অনুবাদগুচ্ছ যা হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হতো না।" আশ্চর্য উক্তি। এই কি শ্রদ্ধার মনোভাব ? যে কবির সমগ্র কাব্য অনুবাদ করছি, তাঁর ভাষা ভালো জানা এবং ভালো না-জানার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে ব'লে মনে না করা ? যাই হোক, আমার. কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধদেব বসু ইংরিজীর মতো ফরাসী জানলে অনুবাদ আরও ভালো হতো, ইংরিজী তর্জমাগুলো তিনি আরও ভালো ক'রে যাচাই করতে পারতেন, অন্তত যে ধরনের সব ভাষাগত ভুল তিনি করেছেন তা করতেন না। বিদেশী ভাষার অনুবাদে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব, ভালো জানলেও হয়। কিন্তু ভুলের সম্ভাবনাকে আমল না দেওয়াটা খুব আশ্চর্যের। এখানে তাঁর কয়েকটি ভুলের উল্লেখ করছি :

প্রথমেই বোদল্যার-এর কাব্যগ্রন্থের নাম। Fleurs du Mal 'ক্লেদজ কুসুম' হবে কেন ? এক্ষেত্রে অবশ্য ফরাসী ভাষাজ্ঞানের প্রশ্ন ততটা নেই যতটা আছে বিবেচনার প্রশ্ন। ক্লেদে জন্মালেও কুসুম খুব ভালো হ'তে পারে। পদ্মের নাম তো পঙ্কজ। কিন্তু ফুলগুলো খারাপ এই অর্থেই বোদল্যার নামকরণ করেছিলেন। বিষাক্ত, অসুস্থ, এ সব বিশেষণ তিনি নিজেই প্রয়োগ করেছেন। প্রচ্ছদপট প্রসঙ্গে তাঁর যে বর্ণনা আছে তা থেকেও এ নামের তাৎপর্য বোঝা যায়। অতএব 'ক্লেদজ কুসুম' ঠিক নয়।

La Ge´ante (দানবী) কবিতায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার অতীতের কল্পনায় কবির মনের অভিলাষকে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু অনুবাদে তা ঘটনা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

'তবু অতৃপ্তা'য় শেষ স্তবকটির যে অর্থ পাই, মূলের অর্থ তার বিপরীত। "তোমার শয্যার নরকে আমি প্রসাপিনা হতে পারি না", এই উক্তি অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "যেহেতু নরক তোর শয্যা আর আমি প্রসার্পিনা।" শয্যার নরকে প্রসার্পিনা হতে না পারার এই আক্ষেপ থেকেই সমালোচকরা বোদল্যার-প্রণয়িনী জ়ান দ্যুভাল-এর সমকামী প্রবণতা অনুমান ক'রে থাকেন।

ফরাসীতে lubricite´-র অর্থ কামুকতা। তাকে ধরা হয়েছে: পিচ্ছিলতা। ফলে, যে বাক্যাংশের অর্থ "কামুকতার সঙ্গে সরলতা যুক্ত হয়ে", তা অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "সরলে পিচ্ছিলে মেশা" (অলংকার, ৪র্থ স্তবক)। এই কবিতারই ষষ্ঠ স্তবকে la এবং elle শব্দ দুটিকে প্রেয়সীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু ও দুটি শব্দ "আমার আত্মা"র সর্বনাম। ফরাসীতে âme স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। স্বভাবতই স্তবকটি অনুবাদে অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে। Lubrique মানে কামুক। 'এক শব' কবিতায় femme lubrique-এর অনুবাদ পড়ি "আর্দ্র নারী"!

'আলোকস্তম্ভ' কবিতার পঞ্চম স্তবকে পড়ি: "চোর, গুণ্ডা, পাণ্ডুরোগী, মদস্ফীত হৃদয় বিরাট—/ এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্যচয়ন/প্যুজ়ে…"। মূলের শব্দ-সম্পর্ক কিন্তু এ রকম নয়। সেখানে "পাণ্ডুরোগী" এবং "মদস্ফীত হৃদয় বিরাট" প্যুজ়ের বিশেষণাত্মক।

ফরাসীতে n'importe ou` মানে: যে কোনোখানে। সুতরাং Voyage কবিতায় n'e´tant nulle part, peut être n'importe ou`-র অর্থ: "কোথাও নেই ব'লে যে কোনোখানেই থাকতে পারে।" কিন্তু অনুবাদে পাই: "কোথাও তা নেই তাই মনে হয় নেই কোনোখানে।" (ভ্রমণ, ২য় অংশ, ২য় স্তবক)।

Sois Sage, Ô ma Douleur—"হে আমার দুঃখ তুমি প্রাজ্ঞ হও" (আত্মস্থতা), এই অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে অনুবাদক ভূমিকায় বোদল্যার-এর দুঃখের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য এবং তার দ্বারা প্রজ্ঞালাভের কথা বলেছেন। Sage-এর বাচ্যার্থ অবশ্যই বিজ্ঞ বা প্রাজ্ঞ। কিন্তু ফরাসী মা অস্থির

ছেলেকে বলেন: Sois sage অর্থাৎ "ছটফট কোরো না, দুরন্তপনা কোরো না, লক্ষ্মী হয়ে থাকো।" বোদল্যার সেই অর্থেই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। শান্ত হয়ে থাকার কথা পরবর্তী বাক্যাংশে আছেও।

অনুবাদ শেষে যে তিনটি গদ্য-অংশ যোগ করা হয়েছে সেগুলি খুব প্রয়োজনীয়: কবিতার টীকা, কালপঞ্জী এবং বোদল্যার-এর জীবনপঞ্জী। প্রথমটিতে লেখক বিভিন্ন কবিতার অন্তর্গত পৌরাণিক উল্লেখগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোনো কোনো কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় অংশটিতে বোদল্যার-এর পূর্ববর্তী, সমসাময়িক এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, যাতে এক বিস্তৃত পটভূমিতে তাঁকে দেখা যায়। তৃতীয় অংশটিতে বোদল্যার-এর জীবনের অতি বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এই যোজনার ফলে কবির এবং তাঁর সৃষ্টির সম্যক পরিচয় লাভ পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। তবে আমার মনে হয়, কবিতার টীকা অংশ বাড়ালে আরও ভালো হতো। অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব বা মূল বক্তব্য কি তা পাঠককে জানানোর প্রয়োজন ছিল। সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে বোদল্যার-কাব্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া যখন লেখকের উদ্দেশ্য, তখন কবিতাগুলো অনুধাবনে তাকে আরও সাহায্য করা উচিত। কয়েকটি কবিতার দু-একটি ছত্রের মহিমা সম্বন্ধে অন্যের অভিমত এবং কোনো কোনো কবিতাপ্রসঙ্গে অন্যের কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অনেক কবিতার বা ছত্রের তাৎপর্য কেন ব্যাখ্যা করা হয়নি বোঝা যায় না। কবিতায় টীকা আরও বেশি দিতে গেলে অবশ্য জায়গা আরও বেশি লাগত। কিন্তু সে জায়গা অনায়াসেই করা যেত অনেক অবান্তর জিনিস ছাঁটাই ক'রে। সব অংশ থেকেই। যেমন, টীকার মধ্যে নের্ভাল-এর কবিতায় ফরাসী উদ্ধৃতির কী আবশ্যকতা ছিল? (উদ্ধৃত শেষ ছত্রে দুটি ভুল আছে)। কিংবা 'সিথেরায় যাত্রা' বোঝবার জন্যে কি এ কথা জানা দরকার যে, "কবিতাটির রচনাকালে কবির উপদংশের প্রকোপ উগ্র হয়ে উঠেছিল"? ভেরলেন সম্পর্কেও এই রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যদের বেলায়ই বা কেন করা হয়নি তা বুঝলাম না। মানসিক ও শারীরিক রোগ-বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বোদল্যার-প্রসঙ্গে উপদংশের ভূমিকা উল্লেখ করেন এবং বোদল্যার-বিরোধীরা এই রোগের কথা তাঁদের পক্ষের একটা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান। কিন্তু সে সব মত লেখকের কাছে গ্রাহ্য হবে ব'লে মনে করি না। কোনো কোনো কবিতা

সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, অথচ অন্যগুলো সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি অথবা যেটুকু বলা হয়েছে তা অন্যত্র বিক্ষিপ্ত। সব তথ্য গুছিয়ে পর পর টীকায় সন্নিবিষ্ট করলে পাঠকের উপকার হতো।

কালপঞ্জী দিয়ে রচনাকে ও রচয়িতাকে একটা পটভূমিতে স্থাপন করার রেওয়াজ ওদেশে প্রচলিত, বিশেষত ফ্রান্সে। বাংলা দেশে সেই ভাবে কোনো বিদেশী লেখককে উপস্থিত করার উদ্যম বোধ হয় এই প্রথম। অভিনন্দনীয় উদ্যম সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হলো লেখক ধ'রে নিয়েছেন, সাধারণ বাঙালী পাঠকরা (যাঁদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ) ইওরোপীয় সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই ব'লে পদে পদে ধাঁধাঁ লাগে ; মনে হয়, এই উল্লেখটার কী সার্থকতা। এবং কোনো কোনো উল্লেখের টীকার প্রয়োজন অনুভব করতে হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মঁতেসকিউর মৃত্যু অথবা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গইয়ার বধির হওয়া, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বেটোফেনের বধির হতে আরম্ভ করা ও ৮১৮-তে সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাওয়া অথবা ১৮৭৬-৭৮-এ মনে-র 'সঁা লাজার' চিত্রাবলী অথবা ১৮৯৪-তে ট্রেনে 'ইয়েলো বুক' পড়তে পড়তে অস্কার ওয়াইল্ডের তা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অথবা ১৯০৮-এ পিকাসো ও মাতিস-এর সাক্ষাৎ ইত্যাকার উল্লেখে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

বোদল্যার-এর জীবনী অংশটি সব চেয়ে বিস্তৃত। তাঁর জীবন ও কাল সম্বন্ধে কোনো তথ্য দিতে লেখক কার্পণ্য করেননি। এ জন্যে শুধু বোদল্যারকে নয়, এখনকার সমগ্র আবহাওয়াকে পাঠক জানতে পারে। এ অংশ অবশ্য আরও সংহত হতে পারত। বিশেষত মাঝে মাঝে লেখকের যে সব মন্তব্য আছে তা না থাকলেও চলত। বরং না থাকলে পাঠক অবিক্ষিপ্ত মনোযোগে বোদল্যার-এর জীবন অনুসরণ করতে পারত। জায়গাও বাঁচত। আমি বলছি এই রকম সব মন্তব্যের কথা যেমন: "পিতার অর্থ ও মাতার অর্থের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দারিদ্র্যের চরমে নেমে বোদলেয়ারকে মরতে হ'লো। কী লাভ হ'লো কার? কার ভালো করা হ'লো? যদি বোদলেয়ার দশ বছরে—বা পাঁচ বছরেও—তাঁর পুরো মূলধন উড়িয়ে দিতেন, তাহ'লেও কি এর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে হ'তো তাঁকে? তাহ'লে, দরিদ্র হ'য়েও, অন্তত নিজের টাকা নিজে ভিক্ষে ক'রে নেবার গ্লানি তাঁকে সইতে হ'তো না। কিংবা হয়তো, কোনো উপায় নেই দেখে,

উপায়হীনতার মধ্যেই বাঁচতে শিখতেন—ভেরলেনের মতো।······মনে হতে পারে, যে-কোনো অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর কাজ ক'রে গেছেন, আমরা পেয়েছি এক গুচ্ছ সৌন্দর্য ও পবিত্রতা—এখন এ-সব আলোচনা ক'রে লাভ কী। কিন্তু সত্যি কি কোনো লাভ নেই? যা হয়নি তা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না; তাই বাধ্য হ'য়ে, যা হয়েছে তাকেই সম্পূর্ণ ব'লে ধ'রে নেই।" ...ইত্যাদি (২৪০ পৃঃ); অথবা "সত্য সে [জ়ান] শিক্ষিত ছিলো না, বোদলেয়ারের কবিতার মূল্য কিছুই বুঝতো না, কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? পৃথিবীতে ক-জন কবির ভাগ্যে এমন স্ত্রী বা প্রণয়িনী জুটেছে, কবিতার রসজ্ঞ হবার যার ক্ষমতা ছিলো?...যারা শুনবে বা বুঝবে তাদের আশায় ব'সে থাকলে সৃষ্টি টিকতো না।" (২৬২ পৃঃ)। এ সব মন্তব্য গভীরতার জন্যে অপরিহার্য ছিল মনে হয় না।

প্রসঙ্গত বলি, এ গ্রন্থের গদ্যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করেছি। রচনার অসমতা তার একটা কারণ। তা ছাড়াও অনেক জায়গায় বাক্যগঠন কৃত্রিম এবং শব্দপ্রয়োগ বিসদৃশ, এমন কি কখনো কখনো বক্তব্যবিরোধী মনে হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি: "শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে ;...রদাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার।" (৩ পৃঃ)। "ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারণা দুটি পরস্পরের জন্যে তৃষিত..." (৭ পৃঃ)। "বরেল, তাঁর মহিমা অস্তমিত, পাড়াগাঁয়ে দীনবেশে ও অর্ধাশনে থেকে এই উপন্যাসটি লিখে উঠেছিলেন।" (২৩০ পৃঃ)। "১৮৪৫-এর আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য: আসলিনোর সঙ্গে আমাদের কবির বন্ধুতার সূত্রতার।" (২৪২ পৃঃ)। "তাঁর মনোরম সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে অনেকক্ষণ কথা বললেন..." (২৭৩ পৃঃ)। সব চেয়ে বিমূঢ় বোধ করেছি নিম্নলিখিত দুটি বাক্যের সামনে: "এক বৎসরের কিছু অধিককাল, বালক বোদলেয়ার তাঁর মাতাকে একান্তভাবে ভোগ করেন।" (২১৯ পৃঃ); এবং "বাল্যে যে অল্পকাল তরুণী ও বিধবা মাতাকে একান্তরূপে ভোগ করেছিলেন, সেই 'বাল্যপ্রণয়ের সবুজ স্বর্গে'র স্মৃতি তাঁকে আমৃত্যু হানা দিয়েছে।" (২৩৬ পৃঃ)। ভালো কথা, বুঝলাম না বুদ্ধদেববাবু 'লক্ষ্য' এবং 'লক্ষ', এই দুই শব্দকেই 'লক্ষ' লেখেন কেন; এবং তাই যদি লেখেন তাহলে 'বন্ধ্য' এবং 'বন্ধ', এই দুই শব্দকে দুই রকম না লিখে 'বন্ধ' লেখেন না কেন।

এই গ্রন্থে নামের যে সব উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে তাতে যথেষ্ট ভুল আছে। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ নামের উচ্চারণ ফরাসীতে অনেক ক্ষেত্রেই গোলমেলে। নিয়মও খাটে না। কয়েকটি সুপরিচিত নামের উচ্চারণ উল্লেখ করছি :

'জর্জ সাঁ' নয়, জর্জ সাঁদ্ ; 'জেরার্দ দ্য নেরভাল' নয়, জেরার দ্য নেরভাল ; 'মাদাম দ্য স্তায়েল' নয়, মাদাম দ্য স্তাল ; 'দেনিস দিদেরো' নয়, দ্যনি দিদরো ; 'তিয়ের্স' নয়, তিয়ের ; 'ওয়াতো' নয়, ভাতো ; 'দেগাস' নয়, দ্যগা ; 'ভ্যান গ' নয়, ভান গগ বা ভাঁ গগ (ফরাসী ধাঁচে) ; 'বেলিও' নয়, বেলিওজ্ ; 'রীমস' নয়, র‍্যাঁস ; 'বার্বে দোর্ভী' নয়, বার্বে দরভিলি ; 'কমেদি ফ্রাঁসেস' নয়, কমেদি ফ্রাসেজ় ; 'পোল ভালেরি' নয়, পল ভালেরি ('পোল' বললে শোনায় মেয়ের নাম Paule)। 'বের্গর্স' অবশ্য অনেক ফরাসীই বলেন, কিন্তু নামটার আসল উচ্চারণ বের্গ্‌সন্। 'ম্যুসে' বা 'ভিন্‌ঈ'র আগে 'দ্য' বসানো হয় না যদি না পুরো নাম লেখা বা বলা হয়।

কবিতা সাজানো সম্পর্কে অনুবাদক লিখেছেন, কবির মূল পরিকল্পনা যে সব সম্পাদক অনাহত রেখেছেন, তিনি তাঁদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ফরাসী ভাষায় প্রামাণ্য সংস্করণগুলোতে যে ভাবে এখন সাজানো হয়, এ বিন্যাস তো সে রকম নয়। এ নিয়ে তর্ক ওঠানো যায়, কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। বিন্যাসের স্থাপত্য সম্পর্কে বোদল্যার-এর চিন্তা আপাতত আমাদের কাছে গৌণ। মোটামুটি একটা পরম্পরা থাকলেই হলো। অতএব এ অনুবাদে কবিতার যে ক্রম পাওয়া গেল তাতেই আমাদের খুশী থাকা উচিত।

---

* বোদ্‌লেয়ার: তাঁর কবিতা। বুদ্ধদেব বসু। নাভানা। আট টাকা।

রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জীবন ও শিল্প

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের উনিশ শতকী নবজাগরণে দুটি প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে : ইওরোপের সঙ্গে অন্ধ তুলনায় জাতীয় দৈন্যের ক্ষতিপূরণের বিড়ম্বিত চেষ্টা এবং হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসবিহীন 'সনাতন' ভারতবর্ষের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস। সে যুগে একদিকে প্রতীচ্য সভ্যতার নজিরে এদেশের সমস্ত কিছুর মূল্যায়ন চলে, অপরদিকে সমগ্র মানব সভ্যতার আদি অন্ত যে হিন্দুসভ্যতা সে কুপমণ্ডুক অহঙ্কার অভিমানে কেউ কেউ বর্তমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

এবংবিধ জিজ্ঞাসাহীন ভাবালুতা আমাদের খণ্ডিত জাগরণেরই অনিবার্য ফল। সেই বিভ্রান্তির জের আজও আমরা টেনে চলেছি। গ্যেটের ব্যক্তিগত জীবনের রোমাঞ্চ, অথবা হেলডারলিন, বোদলেয়ার, রিল্‌কে প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের তীব্রতার বৈপরীত্য কিংবা সাদৃশ্যেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-কর্মের মূল্য নির্ধারণে এদেশের বিশ্বসভ্যতাবিশেষজ্ঞরা অকুণ্ঠিত। ঠিক তেমনিভাবে অপর পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁর শিল্পকর্মের ব্যাপারটি অনেকটা স্বসমুখ ঔপনিষদ বাণীমন্ত্র বিশেষ, তার পেছনে কোনও সমস্যার দ্বন্দ্বযন্ত্রণার ইতিহাস নেই। এমন নিশ্চিন্ত সরলীকরণ বোধ হয় আমাদের দেশেই সম্ভব।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মকে বুঝতে গেলে ইতালীয় রেনেসাঁসের সমার্থক তুলনাটি বহুল ব্যবহৃত বলেই প্রথমেই তার স্বরূপ বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবেই বলা যায়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালির সামন্ততান্ত্রিক সমাজবিন্যাসে নবোদ্ভূত বণিকতন্ত্র আঘাত করে, এই ঐতিহাসিক শক্তির সংঘাতের ফলেই রেনেসাঁসের আবির্ভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই তো মধ্যযুগের ভূমিনির্ভর ধর্মাশ্রিত

সমাজবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নিশ্চল ভূমির পরিবর্তে সচল মুদ্রাই তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়, মধ্যযুগীয় বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের সরল স্থিতিশীল ছকটা বদলাতে শুরু করে। নিছক প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসায়িক স্বার্থের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের গিল্ডগুলোর সংগঠন আরম্ভ হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মার্চেন্ট-প্রিন্সদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের পূর্বাভাস পাই এ সময়ের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থবিস্তারের চেষ্টায়। ধনতন্ত্রের এই প্রথম ধ্বজাধারীরা তাঁদের ব্যবসায়িক পত্রের শিরোনামায় লেখেন, "ইন দি নেম অফ গড এ্যাণ্ড প্রফিট!" মাকিয়াভেল্লির প্রিন্সের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণগুলো স্পষ্ট বা অর্ধস্ফুটভাবে তাঁদের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে। বণিকতন্ত্রের শিল্পবাণিজ্যঘটিত আত্মপ্রসারের তাগিদেই অনেক ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়।

অবশ্য শুধুমাত্র অর্থনীতির বা রাজনৈতিক পটভূমিগত বিচারেই কোনও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয়। ইতিহাস নির্মাণে রাজ্যজয়, রাজনীতি অথবা ধর্ম অপেক্ষা মুদ্রণযন্ত্র, বারুদ, কম্পাস প্রভৃতির আবিষ্কারের ভূমিকাই অধিকতর সক্রিয়, ফ্রান্সিস বেকনের উক্তিটি একদিক থেকেই সত্য। দর্শন-সাহিত্য-শিল্পের স্তরে ঐতিহ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বময় জটিল সম্বন্ধে এই ইতিহাস অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়ে ওঠে। আমরা সাধারণ-ভাবেই জানি, রেনেসাঁসের যুগে নতুন সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তার যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তাতে গ্রীকদর্শন-বিজ্ঞানের মানবমুখীন যুক্তিনির্ভর ঐতিহ্য বিপুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু রেনেসাঁসের চৈতন্যকে তার জটিল সমগ্রতায় বুঝতে গেলে গ্রীক ঐতিহ্যের মতো মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও তার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক মনে রাখা দরকার। গ্রীক ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল সমাজজীবনের গভীরেই, সমধর্মী বা বিপরীত নানা চিন্তা-প্রত্যয়ের সম্পর্কে মধ্যযুগে গ্রীক-দর্শন এবং যুক্তি-বিজ্ঞানের চর্চা নিতান্ত কম ছিল না। ইওরোপের সমাজ কোনও যুগেই একেবারে গতিহীন জড় হয়ে পড়ে নি। সেণ্ট টমাস একুইনাসের সমন্বয়সাধনের মনন কিংবা সেণ্ট অগাস্টিনের প্রজ্ঞা আজও অনেকের বিস্ময়ের বস্তু। একুইনাস ও স্কোলাস্টিকেরা যেমন ছিলেন অ্যারিস্টট্লের অনুসারী, তেমনি সেণ্ট অগাস্টিন ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় মরমী সন্তদের চিন্তায় নিওপ্লেটোনিজম তথা

প্লেটোর চিন্তার ঐতিহ্যই চোখে পড়ে। ইতালির নবজাগরণের চিন্তা-নায়কদের প্রত্যয়গঠনে গ্রীক চিন্তাধারার তুলনায় খ্রীষ্টীয়ধর্মবিশ্বাসগত চিন্তার প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। পেত্রার্কা, কিসিনো, এমনকি যাঁকে রেনেসাঁসীয় মানবিকবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা বলা হয়, সেই পিকোদেলা মিরাদোলারও চিন্তায়, জ্ঞানের অনুশীলনে মধ্যযুগের চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে একটি মূল্যবান অংশরূপেই লক্ষ্য করা যায়: পেত্রার্কা, কিসিনো, অগাস্টিনের চিন্তার প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় এবং পিকো অন্তত কিছুটা পরিমাণে তাঁর পরোক্ষ প্রেরণার সূত্রেই প্লেটোর চিন্তার ঐতিহ্যকে পান।

মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই যোগসূত্রের পটভূমিকায়ই বোধ হয় রেনেসাঁসের মানবিকবাদীদের চিন্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে যুক্তিবিজ্ঞানের চর্চা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজন ও শাসনে যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, তাতে মানবচৈতন্যের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনাই প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আসে। অধিকাংশ মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মতো অভ্রান্ত জ্ঞানে শুধু অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বে আবদ্ধ না থেকে ইতালীয় মানবিকবাদীরা তাঁদের মনের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন, চলিষ্ণু জাগ্রত মননের সঙ্গে সমস্ত ঐতিহ্যের সম্বন্ধপাতে মানবমনের শক্তিকেই অনুভব করেছিলেন নানা ভাবে। মানবমনের মতো বিস্ময়কর মহৎ আর কিছুই নেই, খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের আবেগে অনুপ্রাণিত পেত্রার্কার এই বোধ সেনেকার বচনে পরিপুষ্ট হবার কোনও বাধা থাকে না। অনুসন্ধানের, যুক্তির পথে সত্যান্বেষণে মানবিক প্রজ্ঞার যে ক্ষমতা প্লেটোবাদের ঐতিহ্যের ধারক কিসিনো উল্লেখ করেন, তাতেও এই মানবমর্যাদাবোধ উদ্ভাসিত। অ্যারিস্টট্লপন্থী পিয়েত্রো পম্পোনাৎসিও মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেন ভিন্নতর যুক্তির বিন্যাসে। কিন্তু পিকোদেলা মিরাদোলার মানবমহিমাবিষয়ক রচনায়ই সর্বপ্রথম মানবিক মূল্যজ্ঞান নতুন তাৎপর্যের গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকো মানবচৈতন্যের স্বাধীন ক্ষমতা এবং অপরিসীম সম্ভাবনাই তুলে ধরেন: নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়ই মানুষ নিজেকে গড়তে পারে। সে কোনও সীমায় শৃঙ্খলিত নয়, নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানে। পিকোর এই মানবিক প্রত্যয়েই রেনেসাঁসের চিন্তাধারার মৌলিকতা সব থেকে বেশি স্পষ্ট। অতীতের জগচ্চিত্রে মানুষের স্থান কেন্দ্রীয় হলেও ছিল স্থির, নির্দিষ্ট, এবার সেই ছকের বাইরেই মানুষের স্বকীয় শক্তির উপলব্ধি এবং বিচার। ইতালীয় রেনেসাঁসের

পুরুষার্থ বলতে আমরা নব শিল্পবাণিজ্য-প্রসারসমৃদ্ধ সমাজপটে প্রধানত গ্রীক ঐতিহ্যের ধারানুসরণে জগৎ ও জীবন বিষয়ে জিজ্ঞাসু মানসের এই বিস্তার, আত্মোপলব্ধির উল্লাসময় শক্তিকেই বুঝি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইওরোপীয় ঐতিহ্যের ধারা গভীর ও প্রবল। সেই ঐতিহ্যের পটেই তো দান্তে, চসার কিংবা শেক্স্পীয়রের প্রতিভার স্বকীয়তা আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে (যাঁদের গভীরতার সঙ্গে অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে নেবার সাধ আমাদের হয়)। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সন্ধিক্ষণের কবি দান্তে কিংবা কাভালকান্তির কবিতার স্ফটিকসংহত দীপ্তি প্রভেন্স এবং টুস্কান্তির কাব্যঐতিহ্যেই তো স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। কবিত্বের গভীর রসায়নেই দান্তে লোকভাষার সঙ্গে ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে যেভাবে মেলান, তাতেই তাঁর গীতিকবিতা এবং স্বর্গ ও নরকের মহাকাব্যের সুগঠিত বিন্যাসের চারিত্র্যলক্ষণ একদিক থেকে আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়। দান্তে তাঁর গীতিকবিতার বই 'নবজীবন'-এ (ভিট নুওভা) সঙ্গতকারণেই যেমন নিজের ও সহকর্মীদের নতুন কাব্যপ্রকরণের পরীক্ষায় ভার্জিল, লুকান, হোরেস, ওভিদ প্রভৃতি কবিদের নজির টেনেছেন, তেমনি ল্যাটিন কাব্যের অক্ষরমাত্রিক বিন্যাসের কারুকর্মের পরিবর্তে ইতালীয় দেশজ ভাষার ছন্দঃস্পন্দন গ্রহণের পশ্চাতপট হিসেবে প্রভেন্স ও টুস্কানির কাব্যঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। চসরের কবিপ্রতিভাও তো মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েছিল। আর শেক্স্পীরিয় কবিত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা আমাদের যতই বিস্মিত করুক, তার পটভূমিটি চোখে না পড়ে পারে না। মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য এবং মাকিয়াভেল্লি কথিত রেনেসাঁসীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের টানাপোড়েনেই তিনি তাঁর নাটকের ট্র্যাজিকদ্বন্দ্বের পুরুষার্থকে রূপ দেন।

ইতালির রেনেসাঁসের মূলে যে পরিবর্তন ছিল, তাতে মেদিচিদের মতো মার্চেন্টপ্রিন্সদের আবির্ভাব ঘটে, শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। আর আমাদের নাগরিক সমাজে দেখা দিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্টনির্ভর বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্সেফ—মধ্যবিত্ত চাকুরে। চাকরি সংগ্রহই ছিল এদের 'এণ্টারপ্রাইজ', মূলধন ইংরেজ প্রভুর দাক্ষিণ্যে বিশ্বাস। জনজীবনবিচ্ছিন্ন এই মধ্যবিত্তের খণ্ডিত অস্তিত্বে কোথায় ছিল ইতালির রেনেসাঁসের পাদপীঠ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের জীবনের বিপুল বিস্তার, প্রচণ্ড শক্তি?

আর এদেশের মধ্যবিত্তের অস্তিত্বচেতনায়ই বা কোন ধ্রুপদী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল? উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনের গভীরে বিরাট সংহতশক্তিরূপে গ্রীকদর্শনবিজ্ঞানের মতো কোনো ঐতিহ্যকে আমরা খুঁজে পাই? রামমোহনের বেদান্তচর্চায় এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রবচন উদ্ধারে, বিধবাবিবাহের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় ইতালির হিউম্যানিস্টদের গ্রীক ঐতিহ্যচর্চার তুলনা খোঁজা বিচারবিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। রামমোহনের বেদান্তচর্চা খ্রীষ্টানধর্মপ্রচারের প্রতিক্রিয়ার অন্যতম ফল: বিকৃত আনুষ্ঠানিকতায় কলুষিত হিন্দুধর্মকে নিরাকার একেশ্বরবাদের ভদ্র পরিচ্ছন্ন রূপ দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যেই তাঁর বেদান্তচর্চা। রামমোহন তো স্পষ্টভাবেই বলেন, সমাজজীবনের জন্য যুবকদের উপযুক্ত করে তোলার শিক্ষায় বেদান্তের মায়াবাদ অনুপযোগী, সুতরাং পরিত্যাজ্য। বিদ্যাসাগর আরও নির্মোহ। বেদান্ত 'সাংখ্য'কে তিনি ঋজু কঠিন ভঙ্গীতেই ভ্রান্তদর্শন বলে নির্দেশ করেন; বিধবাবিবাহের আলোচনার উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলেন, বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারের প্রয়োজন এই কারণে যে দেশাচারপ্রভাবিত এদেশে শাস্ত্রসমর্থন ছাড়া কোনও কিছুকে শুধুমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব খণ্ডন, গোপীদের সঙ্গে রাসলীলার আধুনিক ব্যাখ্যা, "ভূরি ভূরি প্রমাণের সাহায্যে" বস্ত্রহরণের অসত্যতা প্রতিপাদন, কৃষ্ণের বহুবিবাহের তালিকা-বিচার—কৃষ্ণলীলাসম্পর্কিত এই স্থূল অসার শাস্ত্রবিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণধী প্রতিভার শক্তিরও ক্ষয় হয়, তা পরাধীন মধ্যবিত্তজীবনের পঙ্গুতারই নিদর্শন। আর তিনি যে নীতিতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্রে আরোপ করেন, সেটা ইংল্যাণ্ডের ইউটেলিটারিয়ানদের সুখতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসার্থক মিশ্রণ মাত্র।

আমাদের সংস্কার-আন্দোলনগুলোতেও ইওরোপের রেফর্মেশনের মূলে যে কৃষকবিদ্রোহ ছিল, তার মতো জন-আন্দোলনের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা কতটুকু মেলে। যে কালে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে গিয়েছে, ইওরোপের সেই অগ্রগতির যুগে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ রোধ বা বিধবাবিবাহ আন্দোলনে আমাদের যে কিভাবে বিড়ম্বিত হতে হয়, তার উদাহরণ তো প্রচুর। বিদ্যাসাগরের মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষও তো শেষ পর্যন্ত কলকাতার সমাজে তাঁর জীবন ও কর্মের ভিত্তি খুঁজে না পেয়ে

অবসন্ন হন, তীব্র নিষ্ফলতার যন্ত্রণায় মধ্যবিত্তজীবনে আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কার্মাটারে অশিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করার স্বপ্ন দেখেন। সামান্য নিরীহ সমাজসংস্কার সম্পর্কেও এদেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধতা কিভাবে প্রকাশ পায়, প্রসঙ্গত তার একটি নমুনা নেওয়া যেতে পারে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে একবার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহের সমর্থনে এক সভা হয়। প্রথম বক্তা জয়গোবিন্দ সোম, অল্প বয়েসে প্রসব করতে গিয়ে মাতার স্বাস্থ্যহানি হয়, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সে আপত্তির খণ্ডনে বলেন: "যদিও বালিকা মাতার অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণ নষ্ট হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কুলীরক মাতা যদি কুলীরক প্রসব করিয়া মরিতে পারে, আমাদের রমণীরাই বা কেন সন্তান প্রসব করিয়া অল্প বয়সে ও অকালে প্রাণত্যাগ না করিবেন?" এবংবিধ কুৎসিত উক্তিতে সায় দেবার লোকের অভাব হয় নি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে সঙ্গতভাবেই এ সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়: "অন্যান্য দেশে ও সমাজে শিক্ষিত লোকেরা উন্নতশীল দলের অধিনায়ক হইয়া সকলপ্রকার উন্নতিসাধক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন; এখানে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার শিক্ষিত লেখকবৃন্দ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক; ইহাদের মত যে দেশের রীতি নীতি ভাল হউক বা না হউক, ঋষিরা প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না: এমন কি; সমালোচনা পর্যন্ত করিতে পারিবে না।"

বাংলাদেশের মধ্যবিত্তমানসের ওই পঙ্গুতা তথা জাতীয়জীবনের দুর্গতির উৎস শুধু ঔপনিবেশিক জীবনেই নয়, তার বাইরেও খুঁজতে হয়। ভারতীয় সভ্যতায় ক্ষয় ধরছিল বহু শতাব্দী ধরেই: এখানকার সমাজজীবন নিজের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষ্ক্রিয়তার অটল কিন্তু গতিহীন প্রতিরোধে কোনও মতে আত্মরক্ষা করেছে মাত্র, ওদিকে ভেতরে ভেতরে রক্ত দূষিত হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সম্ভবত কোনও না কোনও পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যশক্তির প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার ভূমিকা তৈরি হয়েছে এই সভ্যতার অধোগতিতে।

একথা সত্য যে প্রতীকের বিশুদ্ধতায়, পরোক্ষবিন্যাসে ভারতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে তোলার ক্ষমতা অসাধারণ। এখানকার মাটিতেই তো আকাশ এমন অবাধভাবে মেশে, এদেশের সাধকের বিমূর্ত

ভাবনায় মানুষ অতি সহজেই সমস্ত আকাশ পৃথিবী এমন কি ইতরপ্রাণীর সঙ্গেও একাত্ম হতে পারে, নির্বিশেষ ও বিশেষ বাধা পড়তে পারে সামঞ্জস্যের সুষম লাবণ্যে। ভারতীয় মননে স্বাভাবিকভাবেই প্রশান্তির অন্বেষণই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিমূর্তনের সহজাত ক্ষমতা এবং তার প্রতি ঝোঁকের ফলে ভারতীয় শিল্প সৌন্দর্য ধ্যানের সমাহিতিতে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ হয়েছে। অতি তুচ্ছ ধূলিকণা থেকে আকাশ নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে এক নিখিল প্রাণের অনুভূতির শুভময় আদর্শে আমরা নিশ্চয়ই উদ্বেল হই, ভারতবর্ষ কোনোদিন শক্তির আস্ফালনে সাম্রাজ্যলোলুপতা প্রকাশ করে নি, মৈত্রী ও করুণায় সকলকেই বাঁধতে চেয়েছে, আমরা তাতে সঙ্গতভাবেই গৌরব অনুভব করি।

কিন্তু অন্যপক্ষে যখন এদেশের অবক্ষয়ের ইতিহাস স্মরণ করতে হয়, নিজেদের জীবনের ভেতরে এবং বাইরে তাকাই, তখন চিন্তা এবং আচরণের বৈষম্যে আমাদের জীবন কেন এমনভাবে খণ্ডিত হয়, সে প্রশ্ন কি আঘাত করে না? ভারতবর্ষ বিধর্মী বা অবিশ্বাসীকে আগুনে পুড়িয়ে মারে নি সত্য, কিন্তু নানা মিথ্যাচারের গ্লানিতে, অমানুষিক বিভেদের প্রাচীরে, আচার-সর্বস্বতায় তিলে তিলে নিঃশব্দে মনুষ্যত্বের শোচনীয় মৃত্যুর আয়োজন কী কম দুঃসহ? রূপককে আঁকড়ে ধরে দ্বন্দ্বসংঘাতকে এড়িয়ে সমাজজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব কত সহজেই উপেক্ষিত হয়েছে, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিবেকে এই বিরোধের যন্ত্রণাটুকু পর্যন্ত অনুভূত হয় নি। সত্যি, শুদ্ধতার বোধ অনেক সময় বাস্তবজীবনের সমস্যার মাঝখানে আত্মপ্রবঞ্চনার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, প্রতীকের সঙ্গে জীবনের যোগ থাকে নি এবং বিদেশী আক্রমণে ও নানা অনাচারে দেশ যখন ছিন্নভিন্ন, তখন এই বিচ্ছেদকেই পরমার্থ ভেবে বাস্তবকে ভোলার চেষ্টা চলেছে। হেগেল তাঁর ইতিহাসের দর্শনে বোধ হয় সঙ্গত কারণেই বলেন, ভারতীয় নারীমূর্তি এমন এক সৌন্দর্যের আধার যাতে বাস্তবের সমস্ত কাঠিন্য রুক্ষতা অসঙ্গতিকে লুপ্ত করে আত্মা এক অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু মানবিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতার আলোকে একটু প্রখর দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেই সৌন্দর্যের ঐ চিন্ময়মূর্তির আড়ালে অনেক বঞ্চনা, মনুষ্যত্বের অপমান ধরা পড়ে। কী কী প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তথা পুরুষার্থঘটিত কারণে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, এদেশে সর্বব্যাপ্ত সমাজচৈতন্য

এবং সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি, ঐতিহাসিকেরাই তো আমাদের তা দেখাতে পারেন।

অবশ্য অপরদিকে একটু গভীরে তাকালেই বোঝা যায়, প্রত্যয় এবং বাস্তব জীবনের ব্যবধানের বঞ্চনা, আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধর্মাড়ম্বরের মরুভূমিতে ভারতীয় সভ্যতা যেমন শুষ্ক, গতিহীন হয়ে আসছিল, তেমনি ফল্গুধারার মতো সাধারণ মানুষের জীবনাবেগ তাতে যথাসাধ্য প্রাণরস সিঞ্চিত করেছে। অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যাধির ক্ষয়েও এই জীবনের আকাশের মতো নির্মল প্রসন্ন ঔদার্য, ক্ষমা, মৃত্তিকার সহিষ্ণুতা, আত্মোৎসর্গের আড়ম্বরহীন নম্রতা—ভারতীয় মানসের শুভবোধের যা কিছু মহত্ত্ব দধীচির অস্থির মতোই শুচিকঠিন রূপে অনুভব করি, মরমী কবিসাধকদের গানে যার আশ্চর্য প্রকাশ মেলে। দধীচির অস্থির মতোই কঠিন, কিন্তু দুর্ভাগ্যত তা দিয়ে এমন বজ্র তৈরি হয় নি যাতে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ হয়ে ঐ ফল্গুধারা সমুদ্রসন্ধানী প্রাণপ্রবাহে পরিণত হতে পারে। আমাদের এই ব্রাত্য বাংলাদেশেও তো দেখা যায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যশাসিত ধর্মের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ জীবনাবেগনির্ভর, কিছুটা পরিমাণে অনার্যসংস্কৃতিঘেঁষা লোকমানসের ধারা, অনেক দুঃস্থতার গ্লানিতেও যা কখনও শুকিয়ে যায় নি। এই স্রোতেরই পরিচয় মেলে শিবদুর্গার লৌকিক গৃহস্থালীর বর্ণনায়, মঙ্গলকাব্যের জগতে, নানা গাথায় গানে, পট ও অন্যান্য শিল্পে।

এই জীবনের সঙ্গে মধ্যবিত্তের যে দুস্তর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেছিল, ইংরেজি শিক্ষা কিংবা ভারতীয়তার আড়ম্বরের তলায় তার যন্ত্রণা অনেককেই অনুভব করতে হয়েছে এবং সেটাই ছিল আমাদের আত্মসচেতনতার প্রকৃত রূপ। ইওরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে মিথ্যা তুলনার জের না টেনে তার সীমাবদ্ধতায়ই উনিশশতকী জাগরণের নিজস্ব মূল্য বোঝার চেষ্টা করলেই আমরা লাভবান হতে পারি। যে সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আত্মগ্লানির ক্ষোভে মধ্যবিত্তের আত্ম-অন্বেষণ শুরু হয়, চমকপ্রদ সাফল্যের পরিবর্তে সততায়ই তার মূল্য অনুধাবনীয়। ইওরোপের সংঘাতে প্রগল্‌ভ, তৃপ্ত উচ্ছ্বাসে নয়, আত্মচেতনার যন্ত্রণায়ই এদেশকে খুঁজেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বিভ্রান্তি সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রও।

সেই যন্ত্রণাজর্জরিত চৈতন্যের সূত্রেই মধুসূদনের কাব্যোন্মাদনা ইওরোপ-মোহের প্রাথমিক লক্ষ্যভ্রষ্টতার পর দেশীয় ঐতিহ্যে তার শেকড় খুঁজে পায়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ সংস্কৃতের আড়ম্বর, হোমরীয় রূপক-উপমা এবং মিল্‌টনীয় ছন্দের সজ্জা যতই থাকুক, তার দেশজ ভাষার চালই আমাদের রক্তে সুর তোলে। মধুসূদনের চেতনায় দেশের সংস্কৃতি গভীর হয়েছিল বলেই তাঁর ইওরোপীয় সাহিত্যের চর্চা অনেকটা পরিমাণে সার্থক হতে পেরেছিল। তাঁর প্রহসন দুটোর ভাষার সজীবতা লোকায়ত জীবনেরই। হুতোম এবং দীনবন্ধুর ব্যঙ্গের নির্মোহ শুভবোধেও ইওরোপের সংঘাতমথিত নবজাগ্রত চৈতন্যের সঙ্গে দেশজ জীবন ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের সেই ধারাই লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের ইওরোপীয়সুলভ পৌরুষের উৎস এখানেই, দেশের মাটির গভীরে তাঁর অস্তিত্বের ভিত্তি ছিল বলেই ডিরোজিওর শিষ্য ছিন্নমূল ইয়ংবেঙ্গলদের তুলনায় ইওরোপের মুক্ত আকাশের আলোয় তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রবলশক্তিতে বিকশিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে আবার একথাও মনে রাখতে হয়, আমাদের জাগরণের এই সমন্বয়ের ধারা জাতীয়জীবনের বিড়ম্বনায় অসম্পূর্ণ ছিল, না হলে বিদ্যাসাগরকেও এভাবে ব্যর্থতার যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে হবে কেন।

তিন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মপরিবারের কিছুটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন এবং অতিমাত্রায় শালীন মার্জিত-রুচির পরিবেশে সেই ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কস্থাপনের সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয় নি। তাঁর নিজের কথায়ই জানি, বাল্যকালেই তিনি পিতৃদেবের কাছে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ঔপনিষদাশ্রিত ধর্ম-সাধনায় লালিত হন।

কিন্তু তাঁর কাব্যে উপনিষদের প্রভাব নির্ণয়ের বা তাঁকে উপনিষদের কবি হিসেবে প্রমাণিত করার চেষ্টা না করে তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের সাক্ষ্য নিলেই দেখা যায়, নিজস্ব কবিস্বভাবের দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ায়ই তিনি ভারতবর্ষকে খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন তো তাঁর সীমার দ্বন্দ্ব এবং নিজের দুর্বার কবিত্বসঞ্জাত পুরুষার্থবোধে তা অতিক্রম করার মহৎ প্রয়াসেরই ইতিহাস; উপনিষদের মন্ত্রে তা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু তাকে উপনিষদের সঙ্গে একাকার করে তুললে আর যাই হোক, তাঁর কবিস্বভাবের চারিত্র্য আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয় না।

কোনো সরলীকরণকে প্রশ্রয় না দিলেই আমাদের চোখে পড়ে জিজ্ঞাসু

তাৎপর্যানুসন্ধান। মনের তৃপ্তিহীন যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর জীবনের নিজের ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনজীবনের অভিশাপজনিত আমাদের অস্তিত্বের মৌল অসঙ্গতি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন, দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি নিজের এবং স্বদেশের সীমার বাধাকে জয় করার চেষ্টাই করেন জাগ্রত মননের জিজ্ঞাসায়, মানুষকে খোঁজার ব্যাকুল আগ্রহ থেকেই উৎসারিত শিল্পের নব নব পরীক্ষার কঠিন পরিশ্রমে, অর্থাৎ সংক্ষেপে তাঁর কবিপ্রতিভার চারিত্র্যে। এই শক্তির দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ায়ই তিনি আমাদের নবজাগরণের চিন্তা-ভাবনা, অন্বেষাকে এক বিশ্বমানবিক অখণ্ডতার ব্যঞ্জনায় বিস্ময়কর পরিণতি দান করেন।

এই পরিণতি সহজসাধ্য ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে নিজের ভেতরে, পরিবারের এবং বাইরের সমাজেও নানা সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চিন্তায় এবং আচরণে সমাজের একটি অগ্রণী অংশ ছিল। একবার রবীন্দ্রনাথকে তার 'সম্মানিত সদস্য'রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে এ সমাজের এক বিশিষ্ট নেতা 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত এক পত্রে লেখেন: "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) হস্ত হইতে আরও অনেক উপন্যাস ও কবিতা বাহির হইয়াছে। সে সকল উপন্যাস ও কবিতার সকলগুলিই সুরুচিসম্মত নহে। তাঁহার কৃত উপন্যাসের কোন কোন খানি শ্লীলতার সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে; তাঁহার কৃত কোন কোন কবিতার সম্বন্ধেও সে কথা বলা যাইতে পারে।...তাঁহার কৃত কোন কোন উপন্যাস ও কবিতা সম্বন্ধে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিরই যে এই অভিযোগ এমনও নহে; তাহা এদেশের সংবাদপত্রাদিতেও ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কৃত কোন কোন উপন্যাসে সমাজস্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল সুরীতি-নীতি সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, তাহার বিরুদ্ধেও অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কৃত একখানি উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের প্রতিও বিশেষ কটাক্ষ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষভাবে সংকীর্ণ বলিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। অথচ যে সব স্থানে তিনি ব্রাহ্মচরিত্র সংকীর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন, সে সব স্থলে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এখন বিবেচ্য এই, যাঁহার হস্ত হইতে রুচিতে হীন, অশ্লীল এবং

সমাজস্থিতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশক উপন্যাস এবং কবিতা বাহির হইয়াছে, তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করা উচিত কি না?" এমনিভাবে নানা সংস্কারে তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছিল, যেমন সংকীর্ণ জাতীয়তা কিংবা বাঙালিয়ানার মোহে তাঁর বিরুদ্ধে ভুল বোঝার অবিচার করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ।

অবশ্য আমাদের বিক্ষিপ্ত সমাজের সীমাবদ্ধতার ক্ষতি অনেকটা পূরণ হয়েছিল পদ্মাপ্রকৃতির শুশ্রূষায়, কবি তাঁর মূল্যবোধের বিকাশের সব থেকে অনুকূল ক্ষেত্রটি এখানেই পান। প্রকৃতির প্রতিশোধে যে জীবনাভিজ্ঞার সূত্রপাত, পদ্মার তীরে প্রকৃতি ও গ্রামজীবনের সংস্পর্শেই তার যথার্থ বিকাশ ঘটে। কলকাতার সদর স্ট্রীটের প্রগল্ভ অগভীর উচ্ছ্বাসে নয়, নির্ঝরের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছিল পদ্মার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে।

প্রকৃতি তো এদেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং সহজ সম্বন্ধে বাঁধা, তার আত্মীয়তা সম্পূর্ণ অবারিত। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক ইংরেজ কবির মতো প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে কষ্টার্জিত আবিষ্কার ছিল না। এই প্রকৃতিতে তাঁর জীবনের সমগ্রতার বোধ সঞ্জীবিত হয়েছিল বলেই এ যুগে তাঁর কাছ থেকে আশ্চর্য ছোটগল্প এবং 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র পরিণত কবিতাবলী পাই। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি যে বিশ্বভাবনার উপযোগী করে তুলেছেন, এ পর্বেই তা আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারি। ছোটগল্পগুলোয় বাঙলাদেশের গ্রামজীবনের সুখদুঃখ সমস্যার পটেই জীবনের বিরাট দিগন্ত উদ্ভাসিত। তাঁর প্রকৃতির রূপায়ণেও চেতনার বিস্তার লক্ষ্য করার মতো। বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রকৃতিকে একটু সংকীর্ণ প্রাদেশিক লাগে, যদিচ তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আমাদের মনকে টানে। এদেশের গার্হস্থ্যজীবনের নানা সম্বন্ধেই প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর গল্প এবং কবিতায় আকাশ মাটি জলের চিত্র বিশিষ্টরূপে বাঙলার হয়েও বিশ্বপ্রকৃতির ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণতা পায়।

আমাদের পরাধীন অভিশপ্ত জাতীয় জীবনের বিড়ম্বনায়ই মাঝে মাঝে তাঁর মানসের আকাশ মাটির সংস্পর্শ থেকে যেন একেবারে বিচ্যুত হয়। তাঁর কাব্যের অতি সূক্ষ্ম, মার্জিত, পেলব সৌন্দর্যে মন ভরতে চায় না। নক্ষত্রের জগতের মতোই তাঁর শুদ্ধতাকে সুদূর লাগে, থেকে থেকেই

আমাদের অনেকেরই মনে হয়, সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাঘটিত সংবেদ্যতায় আসে না বলেই তাঁর শুদ্ধতার প্রত্যয় নিরক্ত, প্রায় অশরীরী। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়, প্রীর‍্যাফেলাইট কবিদের অহংমত্ত সৌন্দর্যবিলাসের সঙ্গে কীট্‌সের জীবনের সমগ্রতাসন্ধানী সৌন্দর্যধ্যানের পার্থক্যের মতোই তাঁর সৌন্দর্য-অভীপ্সা বিচ্ছিন্নতাবাদী আধুনিক কবিদের অহংসর্বস্ব বৈনাশিক-বুদ্ধিসঞ্জাত নয়, নিজস্ব সত্য ও মঙ্গলবোধের সমগ্রতায়ই তা সার্থকতা খোঁজে।

আমাদের আবার বিস্ময়ের সঙ্গেই আবিষ্কার করতে হয়, নিজের কবিস্বভাবের দ্বন্দ্বময় প্রেরণায়ই বিরোধ অসঙ্গতিতে পূর্ণ এই বসুন্ধরার মমতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানের ঐ স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, পূরবীর সুরেই বেঁধেছেন বিশ্বজনের প্রাণস্পন্দিত ধরণীর সীমারই অসীম সৌন্দর্যকে। আবার সেই স্বভাবের তাগিদেই তো তাঁর আকাশের অধরার ধ্যান ছড়ার ছন্দের অনুরণনে দেশজ রীতির ঘনিষ্ঠতায় এই পৃথিবীরই ক্ষণিকা পলাতকার ব্যাকুল সন্ধানে পূর্ণতার সার্থকতা পেতে চায়। উপন্যাসেও এই মহৎ শিল্পী তাঁর শুভবোধে জীবনের সমগ্রতাই সন্ধান করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রণাজর্জরিত যে আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উপন্যাসে তাকে ধরার চেষ্টা করেন বৃহত্তর তাৎপর্যে। 'গোরা' এবং 'চতুরঙ্গ'-এ উনবিংশ শতাব্দীর জনসমাজবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের যন্ত্রণার পটে জীবনের সাযুজ্য সন্ধানে গোরা এবং শচীশের দুঃখের সাধনা বৃহত্তর জীবনে ব্যক্তিচৈতন্যের মুক্তির সম্ভাবনায় আমাদের চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার প্রচণ্ড শক্তিতেও অনেক সময় ঔপনিবেশিক জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, তাঁর শেষপর্বের গল্প-উপন্যাসে এবং 'বাঁশরী'র মতো নাটকে তার্ উদাহরণ পাই। 'গোরা' 'চতুরঙ্গ'-র আত্ম-সচেতনতার সমস্যার বদলে 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'তিন সঙ্গী' প্রভৃতি রচনার অসুস্থ আধুনিকতার জলুষের লোভও যে তাঁর শক্তির অপচয় ঘটায়, তা আমাদেরই রুগ্নজীবনের দুর্ভাগ্য। সাধারণ পরীক্ষায়ই এ রচনাগুলোর চলতি ভাষার বিচ্ছিন্নতার কৃত্রিম নাগরিক চমকের তুলনায় 'গল্পগুচ্ছ' বা 'গোরা'র প্রাণবন্ত সাধুভাষার অখণ্ডতার শ্রী চোখে পড়ে। কবিতার পরোক্ষ-বিন্যাসের বিশেষ সুবিধার ব্যাপার ছেড়ে দিয়েই আমরা দেখি: এক হিসেবে ঐতিহ্যবিহীন বাংলাগদ্যে আমাদের খণ্ডিত জীবনের দায়ভাগ ছিল

সব থেকে বেশি, এ বিড়ম্বনা তার আবির্ভাবকাল থেকেই লক্ষণীয়। মুক্তি এবং সম্ভাবনার উৎস ছিল সাধারণ জীবনের ভাষার সঙ্গে 'যোগাযোগ'-এ, অর্থাৎ ঐ জীবনে প্রাণসংগ্রহে। মধুসূদনের প্রহসন এবং দীনবন্ধুর নাটকের ভাষায় তার উদাহরণ যেমন মিলেছে, তেমনি ঐ প্রতিভাধর কবির 'হেক্টরবধ'-এর হাস্যকর দুষ্পাচ্য ভাষায়, দীনবন্ধুর ভদ্র চরিত্রগুলোর আড়ষ্ট নিষ্প্রাণ সংলাপে মধ্যবিত্ত মানসের দ্বিধাও পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্যান্য উপন্যাসসুলভ মিথ্যা আড়ম্বর ছেড়ে 'ইন্দিরা'য় জীবনের সহজ ধারায় আকৃষ্ট হন বলেই এ রচনায় তাঁর গদ্যের প্রাণময়তার দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়। এবং বঙ্কিম যন্ত্রণা-বোধের মমতায় উনবিংশ শতাব্দীর আত্মসচেতনতার সমস্যা মোটামুটি সমগ্রভাবে রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন বলেই 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর গদ্য উপন্যাসগুলোর তুলনায় অনেক সজীব, সচল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐ সীমাবদ্ধতায়ই তাঁর শিল্পীস্বভাবের মহত্ত্ব বোঝা যায়, যার দুর্মর গরজে তিনি কোনওদিন স্থির তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। সেজন্যেই তো তাঁর কাব্যসাধনার শেষ পর্বেও দেখি জীবনবোধের সততায় তাঁর মানসের বিস্ময়কর প্রাণশক্তি। এ যুগেও সাধ ও সাধ্যের বেদনা ঘুরেফিরেই তাঁর কবিতায় আসে, নিজের অসম্পূর্ণতায় তাঁকে ব্যথিত হতে দেখা যায়:

"মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।"

কিন্তু কবির মানবিকতা নৈরাশ্যের গ্লানিতে অবসন্ন হয় না, সর্ববিধ অসঙ্গতিতেই সমন্বয়ের ভারসাম্য খোঁজে। ক্রূর লোভে, নিষ্ঠুর পীড়নে ক্ষতবিক্ষত আধুনিক সভ্যতার ভবিষ্যৎ-ভাবনা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে, সেই সচেতনতায়ই কবির কল্যাণবোধ আরও গভীর হয়ে দেখা দেয়, ভাষার সংহত দীপ্তিতেই তা অনুধাবনীয়। এই মঙ্গলের উপলব্ধির শুভ্রতায় মাঝে মাঝে পদ্মার স্মৃতির উজ্জীবনে দেশজ জীবনের প্রতি আকর্ষণ মমতার স্নিগ্ধ রঙ ছড়ায়, কখনও বা তাতে সভ্যতার দুর্গতিতে তাঁর ক্ষোভ বেদনার

অগ্নিবর্ণের আভাস জেগে ওঠে। কবির ব্যাধির যন্ত্রণা তো সভ্যতার দুর্গতির বেদনার রূপক হয়ে ওঠে, তার পটেই তো প্রকৃতির নির্মল প্রসন্নতায় তাঁর শান্তির অমৃতসন্ধান এমন গাঢ়বদ্ধরূপে উদ্ভাসিত হয় :

"প্রত্যূষে দেখিনু আজি নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক ;
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত
রক্ষা করিয়াছে তারে
যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
বিক্ষুব্ধ এ মর্তভূমে
নিজের জানায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।"

কবি তাঁর জগৎ ও জীবনের আস্তিক্যবোধে রাত্রির বিচ্ছেদের অন্ধকার থেকে প্রভাতের ঐক্যসঞ্চারী আলোকে, বিরোধ পার হয়ে সঙ্গতির আনন্দে পৌছোন:

"খুলে দাও দ্বার ;
নীলাকাশ করো অবারিত ;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে,
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে ;
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে॥"

সভ্যতার অবক্ষয়ের অন্ধকারে জগৎ ও জীবনের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনার রসায়নে নতুনভাবে রূপায়িত হয়। এই পৃথিবীর "ধূলি"তেই "সত্যের আনন্দরূপ" অনুভব করে শেষ বিদায়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হন সে "ধূলি"র প্রতিই নম্র প্রণামনিবেদনে। কোনও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতেই তাঁর এই ঐকান্তিক শুভবোধের সর্বভূমিকতার মহত্ত্বকে খর্ব করা সম্ভব নয়।

চার

তৃপ্তিহীন যন্ত্রণায়, স্বকীয় মূল্যবোধের বিরামবিহীন জীবনের তাৎপর্য-অন্বেষণে, চৈতন্যের বিপুল বিস্তারে, শিল্পকর্মগত পরিশ্রমে ও বিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে সাহিত্যিক চারিত্র্যের ঐতিহ্য নির্মাণ করে গিয়েছেন, দুঃখের বিষয় আমরা এখনও তার মূল্য বোঝার চেষ্টা করি নি। ইওরোপীয় কাব্যের তীব্রতায় তাঁকে পরিমাপ করতে যখন লুব্ধ হই, তখন সমস্ত জটিলতা সত্ত্বেও সেখানকার সচল সুবিন্যস্ত ঐতিহ্যের পাশাপাশি এদেশের জীবনের দ্বিধাসংশয়-বিক্ষিপ্ত, নানা প্রাচীন পরিণতি ও অপরিণতিতে অসম রূপ স্মরণ রাখা উচিত এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার চরিত্রশক্তি বোঝার দায়িত্ব স্মরণীয়। আমাদের অসম্পূর্ণ জাগরণের সঙ্গে তাঁকে যান্ত্রিকভাবে সম্পর্কান্বিত করার চেষ্টায়ও বোধহয় এই শক্তির মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রণাময় আত্মসচেতনতা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বরূপের বিশ্বভাবনায়, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীর্ঘজীবনব্যাপী দীপ্ত গীতরচনায় এক বিশ্বমানবিক, সম্পূর্ণ নতুন পরিণতি পায়। আমাদের দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ জীবনে এবং সীমিত শক্তিতে সে পরিণতির সমগ্র ঐশ্বর্যকে হয়তো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এমন কি তাকে কিছুটা পরিমাণে সুদূরও মনে হতে পারে। কিন্তু এখনকার লোভে মোহে আত্মবিক্রয়ের নির্লজ্জ উল্লাস, সজ্ঞান মিথ্যাচার ও সাহিত্যিক বিবেকহীনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নানা দিক থেকে তাঁর শিল্পীস্বভাবের চরিত্রশক্তির মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টায় আমাদের জীবন ও শিল্প-সংস্কৃতির উপকার অনেক।

কয়েকটি কবিতা

বিষ্ণু দে

ছুই কর্মীর এক দাদার জন্য তর্ক

অনেক বছর পরে কয়েক সপ্তাহ কাটে গ্রামে গ্রামান্তরে,
ছুটি নয়, প্রচারে সফরে নির্বাচনে।
ভালো লাগে রৌদ্রময় বিস্তীর্ণ আকাশ, নানা পাখিদের ডাক,
থেকে থেকে যাই-যাই পশ্চিমের হাওয়া।

শিমুলের গায়ে আজো রক্ত নেই।
আর রোগা আমড়া ফ্যাকাশে আর সজনের ফুল
সবে ফুটবে ভাবছে আর উত্তরের ডাঙার পলাশে
এখনও ধূমল রোগ।
অবশ্য দক্ষিণের পঞ্চাশটা কলমের আমে বউল ধরেছে।
শুধু বর্ণাঢ্যবিলাসে বুগেনভিলিয়াগুলি চার রঙে হেসে ওঠে
আমাদের আস্তানায় বাগানবাড়িতে থামে থামে,
গোলাপের জের এখনো রয়েছে কিছু।
তবে এরই মধ্যে টিলার তলার সর্বহারা জ্যামিতিতে
পত্রহীন গোলকচাঁপার গান ওঠে অপরাজিতের।
আর ঝোপে ঝাড়ে তারই পিছুপিছু
হাওয়ার হিল্লোলে দোলে রক্ত-শ্বেতকরবী আবার
গ্রাম্য বন্য পর্যাপ্তিতে।

বহু ব্যাপ্ত দাদার এলাকা।
জীপে আর পায়দলে এ গ্রামে সে গ্রামে
বক্তৃতায় আর বাড়ি-বাড়ি আলাপে সালাপে ক্লান্ত যে সে কথা মানি।

তাছাড়া মনটাও ভার, জানি মাঠে ক্ষেতে আর
—অবশ্য এখন মাঠে ধান নেই, রবিশস্য
এ অঞ্চলে ফলেনি বিশেষ—
গরু মোষ বলদের ছাগলের পাল ছেড়ে দিলে একালে চলে না।
তাই জীপে পায়দলে ঘুরে ঘুরে বলি
প্রতিপক্ষ যে কথা বলে না।

তুমি বলো ব্যাপারটা এলে-বেলে, হয়তো বা তাই,
আমিও তা ভাবি ক্লান্ত যখন ঘুমোতে ক্যাম্পে ফিরি,
এত বড় দেশে যে সাইকেলে হেসে-খেলে
ধান কাটা ধান তোলা খালি হাতে সম্ভব না খালি শীষ চেলে,
দাদাও তা বোঝে না কি ?
তাই গদী ফেলে কাস্তের প্রশংসা করে আলে উঠে,
কারণ সম্প্রতি স্বতন্ত্র নামটাও আর অসম্ভব।

বেশ হাসো, তবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়
শুধু কার্যসিদ্ধি নয়, অবশ্য দাদার আছে স্বাভাবিক দ্বিধা, ভয়,
তাছাড়া কাস্তের গৌরব এখনও বিস্তৃতভাবে
এবং গভীরভাবে তোমরাও বোঝনা বা বুঝলেও
শ্রমসাধ্য একঘেয়ে মেটে মাঠো ধৈর্য ধ'রে
প্রমাণ করোনি সর্বত্র সমানভাবে সকলের মনে।
তাই তুমি আমি ঘুরি গ্রামে গ্রামে আবাদে জঙ্গলে
জীপে পায়দলে দাদার পয়সায় সাইকেলের পিঠে ব'সে।

গ্রামে বনে বসন্তের প্রভাব হৃদয়ে স্নায়ুতে গোপনে
কাজ ক'রে চলে, লক্ষ্য করেছ কি তুমি ?
বসন্ত বাউরীর গানে তোমার কেন্দ্রীয় মার্কা মন
অন্তত একটা সপ্তাহ যদি গলে গেঁয়ো কাফী দেশজ ইমনে,
তাহলেই খুশী হব অনুগত পরিশ্রমী সংযুক্ত সম্ভাবে।
এখনই কোথায় যাবে, চা-টা খাও। খেয়ে তবে যেয়ো।

বরং সে আর তার বোন

মাঝরাতে বাপ ফেরে। কলকাতার রাস্তায় যখন
ক্লান্ত ফাঁকা হাহাকার হঠাৎ হঠাৎ মোটরের চকিত চীৎকারে
দম পায়, তখন বাপটি ফেরে, না শ্মশান না, অন্য আড্ডা থেকে,
তখন সে বিছানায় জানলার দিক থেকে ফেরে, যেন নিজেকে গোপন
ক'রে দেয়ালের রঙে, চুপচাপ চোখ মেলে কিংবা চোখ ঢেকে
অস্পষ্ট আবেগে ভাবে, ভাবে : কি যে ভাববে এবারে।

মা তখন ঘুমে কিংবা ঘুমের ওষুধে অসাড় বালিশে
ওই ঘরে কি যে ভাবে, আপন শিশুর মনে ভাবে তা ছেলেটি,
মা যে কেন অবিশ্রাম কাজে যায়, কোথা যায়, সে কোন আপিসে
ঘুরে ঘুরে নিজেকে যে কালি করে, সে যখন ছুপুরে বাড়িতে
শুয়ে থাকে কথামতো পাশে মা আসে না, না, মা খুব ভালোবাসে,
ইলিশের পেটি
নিজে বেছে তাকে দেয়, নিজে গাদা কাঁটা খায়, বলে :
জিভ চাপিস্ মাঢ়ীতে
দেখবি ইঁদুর দাঁত ফেরত দেবে না। মা-ই বলে, উত্তরাধিকারী
সেই নাকি, বাবাও চেঁচায়। কলকাতার রাস্তায় যখন অনেক ভিখারী

ঘুমোয় অনেক লোক, মড়া যায় শ্মশানের দিকে হঠাৎ চীৎকারে
তখন সে চুপচাপ ভাবে : কাল ভোরে আর ইস্কুলে যাবেই না সে,
মা তাকে ভালোই বাসে, বাবাও হয়তো তাদের ভালোই বাসে,
সে আর বোন নাকি মা বাবাকে বন্দী রাখে, সেই উত্তরাধিকারে
উত্তর দেবেই না আন্টিদিদিমণিদের, বরং সে আর তার বোন
চলে যাবে, শ্মশানে না, বহুদূরে, লেনার জঙ্গলে, দুজনেই ভালুকশিকারী।
কিংবা মোড়ে, ভোটের মিটিঙে, দুজনের দুহাতেই ছবিআঁকা ফ্ল্যাগ
ভারী ভারী।

পোলিং স্টেশনে

লোকটি অদ্ভুত বটে, (কি জানি! হয়তো অদ্ভুত অন্যেরা ?)
প্রত্যহ সে চিঠি লেখে, দূরের প্রেয়সী নাকি স্ত্রীকে, গ্রামে,
মাঝে মাঝে উত্তরও সে পায় বৈকি, কখনো দেরিতে কখনো বা পরপর,
চিঠি লেখে যত্ন ক'রে, ধৈর্য ধ'রে, খামে।

আজ প্রায় সকালেই তার দেখা, নির্বাচনী অর্থাৎ পোলিং স্টেশনে,
লাজুক মেঘলা ব্যক্তি, বলি : কি ব্যাপার, তুমি যে এখানে ?
এই গণ্ডগোলে আজ পণ্ড ক'রে দিলে তো তোমার রববারের ধ্যান ?
প্রায় মুখে না তাকিয়ে গানের গলায় বললে : তার মানে ?

পাঁচটি বছর বাদে একদিন ভোট দিই এইখানে এসে,
আর প্রত্যহ পালন করি নির্বাচন দিন সেই নামে।
তুমিও তো তাই, নয় ?—গলাটা নিচুই, কাছ ঘেঁষে
ব'লেই হঠাৎ দুই চোখ মেলে চায়, রৌদ্র জ্বালে বৃষ্টি হাওয়া ধোওয়া
শ্বেত পাথরের থামে।
চুপ করে থাকি, জানি পটলডাঙায় তার মেসে মাঝে মাঝে
চিঠি আসে, আর সেও প্রতিদিন চিঠি লেখে, যত্ন ক'রে, খামে।

প্রশ্নপত্র

তার তুলনা কি চিরচেনা কলকাতা ?

দুস্থ দিনের অসুস্থ রাত্রির
শহরে যেমন চলে যায় মন দূর
আকাশে বাতাসে মাঠের সচ্ছলতায়

ভিড় ঠেলে ঠেলে হাওড়ায় রেল যাত্রীর
দুর্ভোগ স'য়ে, এই শহরে কি মাতা-
মাতি করে মন, প্রেমিক বা বন্ধুর
জন্যে যেমন করাটাই সঙ্গত ?
নাকি এ তুলনা ভাবছি দুর্বলতায়
জরা যেমনটি ভাবে যৌবনলোভে ?
অথবা যেমন রাজনীতি যদি ডোবে
তখন অনেকে শেয়ারবাজারে ইষ্ট
প্রতিষ্ঠা করে অথবা দেখায় পৃষ্ঠ
বিপ্লবকে বা প্রতিক্রিয়াকে কেউ ?

যতই আত্মজিজ্ঞাসা করে হেয়,
নিশ্চিত জানি ততই আমরা দুজনে
যে মানসলোকে বাস করি, তার শুদ্ধি
আমাদের সব শান্তি কেড়েছে অনুপম
একটি বিরাট শান্তির চির অস্থির
দিনরাত্রির স্বপ্নে। এ শুচি বুদ্ধি
জানি আমাদের ছেড়েছে মুষ্টিমেয়
মানুষের মাঝে যেখানে স্বেচ্ছাবশত
আনন্দ লাল আর নীলাকাশ জঙ্গম
হাজার চূড়ায় চূড়ায় লক্ষ ঢেউ।

ভালোই জানে সে, আমাদের গাঢ় কূজনে
বিশ্ব হাজার খুশি হাতে দেয় তাল।
তাই বুঝি তাকে পাশে খুঁজি অস্থির ?
কলকাতা ফের গ'ড়ে দিতে হবে দুজনে ?

কী বাজাও

রাম বসু

বাতাস তাড়িয়ে দিল বৃষ্টি
বাতাস তাড়িয়ে দিল নীলে দগ্ধ তীব্র কনীনিকা
এবং সমস্ত পাতা, দ্রুত-লুপ্ত আঁশের ঝলক।
গাছ, তুমি দীপ্ত নগ্নতায় দাঁড়িয়ে। ভূষিত করো
আমার জটিল মুখ রেখাচিত্রে ও উপকথায়।

কি বলবে তোমরা আর শূন্যতার দুহিতা বাতাস
সেই মৃত ভালোবাসা ? সে সব বিবর্ণ পাপড়ির
সমৃদ্ধ সুগন্ধ পৃথিবীতে এখনও ছড়ানো আছে।
হৃদয়ের ছাঁচে দুঃসাহসী সজীব মোহানাগুলি
স্তোত্রের মতন উচ্চারিত হয় তোমার শিকড়ে।

আমাদের সময় হয়েছে।
ঘৃণা করি যা স্পর্ধা নয় ও আমরা স্থাপন করি
কয়েকটি সংকেত, মুদ্রা ; তার ছাপ
এঁটেল মাটিতে আর সমারোহ-ঘোষিত-কপালে।

কেন না তোমার মুখ
শ্বেত পাথরে নির্মিত নগরীর স্বর্গীয় মহিমা
কেন না তোমার দৃষ্টি আচ্ছাদিত দুর্লভ বিহঙ্গ।

আমাদের সময় হয়েছে।
তবে আরণ্যক মাতা
শুরু হোক তোমার আদিম অন্ধকার দিব্য-নৃত্য
আমাকে জড়িয়ে নাও চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে।

অঙ্গে অঙ্গে কী বাজাও হে কঠিন হে আমার প্রেম !

কথোপকথন ঃ চোদ্দশ সালে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দেশলাই আছে ? সিগারেট দিতে আপত্তি নেই কারো।
বহুদিন পরে দেখা হলো আজ, চোদ্দশ বঙ্গাব্দ ;
জুয়ায় ফতুর যে কোনো সুযোগসন্ধানী পেতে পারো
ভোগ্য পণ্য রম্য রমণী। সস্তা যেহেতু স্তব্ধ

আপাতত আমি বধির সভ্য সৎকার সংঘের।
চিন্তা নামক ভুতুড়ে বাড়ির মাড়াইনে চৌকাট,
মগজে চারশো বোতলা ছাড়াও ইঁদুর রয়েছে ঢের,
মাঝে মাঝে পাই নিজের বিবেক বিক্রির কণ্ট্রাক্ট।

ব্যক্তিগত কি ? পবিত্র শুধু নিজেরই কণ্ঠস্বর ?
এক পা বাড়ালে দশ হাজার ফুট খাদ,
মাসিক বেতনে স্বয়ংশাসিত স্বর্গে অধীশ্বর
বাচাল গ্রন্থে বেচাল বুদ্ধি, বড়ো বেশি অবসাদ !

কেবল সহজ নিজেই কামানো বন্ধুর দেওয়া ক্ষুরে।
কামাতে কামাতে হঠাৎ ফিনকি-রক্ত, কিসের শব্দ !
ডান হাত বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা গায় রুধিরের অঙ্কুরে
বনস্পতির আবহ ঘনায়। চোদ্দশ বঙ্গাব্দ।

বলেছিল

আন্না আখমাতোভা

সে তো বলেছিল "নেই প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো
পৃথিবীর নারী আমি তার কাছে নই
আপন গহন দেশে বন্যগান যেন
শীতের কঠিনে উষ্ণ আলো সূর্য ওই।

আমার মৃত্যুর দিনে কখনো সে কাতর হবে না।
বলে উঠবে না "বাঁচো" তীব্র আর্ত স্বরে উন্মাদের
হঠাৎ বুঝবে বাঁচা অসম্ভব, অসহ্য যাতনা,
গানহারা হৃদয়ের, সূর্য-হীন এই শরীরের"—

আজ ?

অনুবাদ ঃ শুভময় ঘোষ ও দীপক মজুমদার

খ্রীষ্টের পাপ

আইজাক বেবেল*

এরিনা হোটেলের ঝি। সামনের দিককার সিঁড়ির পাশেই সে থাকত। সেরেগা দ্বাররক্ষীর সহকারী। সে থাকত পেছনের দিককার সিঁড়ির ওপর। তাদের দুজনকার মধ্যে সম্পর্ক ছিল লজ্জার। পাম সানডে-তে এরিনা সেরেগাকে উপহার দিয়েছিল একজোড়া যমজ সন্তান।

নদীতে জল বয়ে যায়। আকাশে তারা ঝিকমিক করে। মানুষ কামার্ত হয়। এরিনা আবার পোয়াতি হলো। তার এখন ছ-মাস। মেয়েদের মাস যেন পিছলে পিছলে যায়। এই সময় আদেশ এল সেরেগাকে সৈন্যদলে ভর্তি হতে হবে। কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

তাই এরিনা গিয়ে বলল : দেখ সারগুনিয়া, তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকার কোনো মানে হয় না। চার বছর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এই চার বছর—তুমি যেভাবেই ব্যাপারটা নাও না কেন—নিদেন পক্ষে দু-তিনটি প্রাণীকে আমি পৃথিবীর আলো দেখাব। হোটেলের চাকরি করা আর ঘাগরা তুলে ঘুরে বেড়ানো একই কথা। এখানে যে আসে সেই তোমার মালিক—তা সে ইহুদীই হোক আর যেই হোক। তুমি যখন ঘরে ফিরবে তখন আর আমার ভেতরে কিছু থাকবে না। আমি তখন ছোবড়া হয়ে যাব, তোমার যোগ্য থাকব না।

ঠিকই তো, সেরেগা মাথা নাড়ল।

অনেকেই আমাকে চাইছে। যেমন ধরো, ঠিকেদার ট্রফিমিচ। কিন্তু ও ভদ্রলোক নয়। আর আছে নিকোলোস্‌ভিয়াৎস্কি গীর্জার ওয়ার্ডেন ইসাই আব্রামিচ। রোগা দুব্‌লা বুড়োমানুষ। তা যাই বলো, তোমার অসুরের মতো তাগদ আর আমার পেটে সহ্য হয় না বাপু। তোমাকে বাপু পষ্ট কথাই বলছি—কনফেসনেও কথাটা আমি এইভাবেই বলতাম—আমার জান

* আইজাক বেবেল বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার একজন শক্তিমান লেখক। দীর্ঘকাল পরে তাঁর গল্প-সংকলন সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—অনুবাদক।

একেবারে খতরা হয়ে গেছে। তিন মাসের মধ্যে আমার বোঝা খালাস হবে, তারপর বাচ্চাটাকে এতিমখানায় দিয়ে ওই বুড়োকেই আমি বিয়ে করব।

এই কথা শুনে সেরেগা কোমর থেকে বেল্ট খুলে বীরের মতো এরিনার পেটের ওপর কষে লাগাল কয়েক ঘা।

এরিনা বলল, দেখো, পেটের ওপর অত জোরে মেরো না। ও তোমারই বোঝা, আর কারুর নয়···

মারের শেষ নেই। মানুষের চোখের জলেরও না। মেয়েমানুষের রক্তেরও না। কিন্তু তার কোনো দাম নেই।

তারপর মেয়েমানুষটি এলো যীশুখ্রীষ্টের কাছে।

ইত্যাদি ইত্যাদি প্রভু যীশু! আমি হোটেল মাদ্রিদ ও লুভরের এরিনা। ওই যে ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটের হোটেলটা। হোটেলে কাজ করা মানেই ঘাগরা তুলে ঘুরে বেড়ানো। হোটেলে যে লোকই আসে সেই তোমার প্রভু, জান-মালের মালিক—তা সে ইহুদীই হোক আর যেই হোক। প্রভু, তোমার আর একজন দাস পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। তার নাম সেরেগা। দ্বাররক্ষীর সহকারী। গত পাম সানডে-তে তাকে একজোড়া যমজ সন্তান উপহার দিয়েছি···

এমনিভাবে সবকথা সে প্রভুকে খুলে বলল।

ধরো, সেরেগাকে যদি সৈন্যদলে ভর্তি হতে না হয় তাহলে কী করবে? ত্রাণকর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

তাও কখনও হয়। পুলিস আছে না! চেষ্টা করে দেখুক—ঘাড় মটকে ধরে নিয়ে যাবে।

তা বটে, পুলিস তো আছে। প্রভু মাথা নিচু করলেন। তার কথা আমি ভাবিইনি। তাহলে তো দেখছি কিছুকাল তোমাকে শুদ্ধভাবে থাকতে হয়—না কি?

চার বছর? মেয়েটা ডুকরে উঠল। প্রভু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে! আমরা পশু-প্রকৃতিকে অস্বীকার করব? না প্রভু, এ তোমার সেকেলেপনা। তাহলে লোক বাড়বে কী করে। না প্রভু, আমাকে কিছু কাজের উপদেশ দাও।

প্রভুর গাল লাল হয়ে উঠল। মেয়েটির কথা তাঁর আঁতে ঘা দিয়েছে।

গড়িয়ে এলো আলক্রেডের ওপর। দেবদূতের সঙ্গে শোওয়া কী তার পোষায়। পাশে শুয়ে কেউ দেওয়ালে থুতু ফেলবে না, নাক ডাকাবে না—তার মতো নোংরা মেয়েমানুষের কী তা সহ্য হয়! না, তার পেটটাকেও তো গরম করতে হবে—সেরেগার কামনায় স্ফীত পেট। ঘুমের মধ্যে দেবদূতকে সে পিষে ফেলল, উল্লাসের ঘোরে একসপ্তাহের শিশুর মতো তাকে পিষে ফেলল, বিশাল দেহের চাপে তাকে চেপটে দিল। দেবদূতের ভূতাত্মা নির্গত হলো। আর চাদরে মোড়া তার পাখা দুটো ফ্যাকাশে অশ্রু বর্ষণ করল।

ভোর হলো। গাছগুলি সব মাথা নিচু করে মাটিতে মিশে গেল। দূর উত্তরে প্রত্যেকটা ফার গাছ পুরোহিতের রূপ পরিগ্রহ করল। প্রত্যেকটা ফার গাছ নিঃশব্দ প্রার্থনায় হাঁটু মুড়ে বসল।

প্রভুর সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, প্রশস্ত কাঁধ, শক্তিমতী। তার বিশাল আরক্ত বাহুতে ধরা রয়েছে দেবদূতের তরুণ শবদেহ।

এই দেখুন প্রভু···

কিন্তু যীশুর কোমল হৃদয় এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। ক্রোধে তিনি অভিসম্পাত দিলেন: পৃথিবীতে যেমন হয়, আজ থেকে তোর তেমনি হবে এরিনা···

সে কি কথা প্রভু, মেয়েটি অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমার দেহটা কী আমি ভারী করে গড়েছি, ভদকা কী আমি চোলাই করেছি, মেয়েমানুষের মন, নির্বোধ আর নিঃসঙ্গ—সে কি আমার সৃষ্টি?

আমি তোর কথা শুনতে চাই না, প্রভু যীশু রাগতভাবে বললেন, তুই আমার দেবদূতকে পিষে মেরেছিস, নোংরা জানোয়ার কোথাকার···

দুর্গন্ধ বাতাসের ঝাপটা দিয়ে এরিনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো পৃথিবীতে, সোজা ৎভেরস্কায়া স্ট্রীটে, হোটেল মাদ্রিদ ও লুভরে। এইখানেই এখন থেকে তার দিন কাটবে। আর এখানে আকাশই সীমা। সেরেগা সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছে। শেষকটা দিন সে মদ খেয়ে হৈ-হুল্লোড় করে কাটাচ্ছে। ঠিকেদার ট্রফিমিচ কোলোম্‌না থেকে ফিরে এসেছে। মোটা সোটা টুকটুকে গাল এরিনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, বা, দিব্যি নেয়াপাতি ভুঁড়িটি···ইত্যাদি।

নেয়াপাতি ভুঁড়ির কথাটা বুড়ো আব্রামিচের কানেও গেল। সেও এসে হাজির হলো। দন্তহীন ফ্যাসফেসে গলায় বলল: দেখো, এরপর আর আমি তোমাকে ধর্মত বিয়ে করতে পারি না। তবে, আর পাঁচজনের মতো শুতে পারি তোমার সঙ্গে···

ঠাণ্ডা মাটি-মায়ের কোলে শোবার বয়েস হয়েছে বুড়োর—এ-সব কথা চিন্তার নয়। কিন্তু সেও এসে পালা করে এরিনার অন্তরে থুতু ছেটাবে। সকলেই যেন শেকলের এক একটা আংটা—রান্নাঘরের যোগালে, ব্যবসায়ী, বিদেশী। প্রত্যেকেই মজা লুটতে চায়।

আমার গল্পের এইখানেই শেষ।

আঁতুরে যাবার আগে—ইতিমধ্যে তিন মাস পার হয়ে গেছে—এরিনা একদিন পেছন দিককার উঠোনে গিয়ে তার বিশাল পেটটা রেশমী আকাশের দিকে তুলে নির্বোধের মতো বলল: দেখ প্রভু কী বিশাল একখানা পেট। শুঁটির মধ্যেকার কড়াইয়ের মতো ওরা এর ওপর ঠুকতে থাকে। কী এর মানে হয় আমি বুঝি না। বুঝতে চাইও না···

এই কথা যখন যীশুর কানে গেল তিনি চোখের জলে এরিনাকে স্নান করিয়ে দিলেন। ত্রাণকর্তা হাঁটুমুড়ে বসলেন ওর সামনে।

আমাকে ক্ষমা করো অরিনুস্কা, তোমার পাপী ভগবানকে ক্ষমা করো। এ আমি তোমার কী করেছি?

কিন্তু এরিনা মাথা ঝাঁকতে লাগল। কোনো কথা সে শুনবে না।

তোমার ক্ষমা নেই যীশুখ্রীষ্ট, সে বলতে লাগল, ক্ষমা নেই। কিছুতেই ক্ষমা নেই।

অনুবাদ: প্রদ্যোৎ গুহ

শরশয্যা

মিহির সেন

ঐ টেবিলের ওপর জল ঢাকা থাকল। বালিশের তলায় বেড্ সুইচ্‌টা গুঁজে দিয়েছি। ফ্যানের রেগুলেটার আছে, ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নিও। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাব, না তুমি শোবার সময় দিয়ে শোবে ?

অপলক দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিলেন স্বস্তি। কৃষ্ণার আতিথ্য শেষ হলে একটু হাসলেন—বেশ পাকা গিন্নী হয়েছিস কিন্তু। বেশ আছিস।

কৃষ্ণা গভীর দৃষ্টিতে স্বস্তিদির চোখের দিকে তাকাল। ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করলেন স্বস্তি। কি দেখছে ও। কি খুঁজছে। সকাল থেকেই মাঝে মাঝে এই সন্ধানী দৃষ্টি তুলে ধরছে ও আমার চোখে। আমার কথা, আমার চলাফেরা নিয়ে তো আমি নিজেকে যথেষ্ট স্পষ্ট করেই ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে সরিয়ে নতুন কোনো আড়াল মুখের আদল খুঁজছে কি আমার চোখের দর্পণে। স্বস্তি নিজের হাসিকে আরো দৃপ্ত করল।

আস্তে চোখ নামিয়ে নিল কৃষ্ণা। গভীর তৃপ্তির স্বর টেনে বলল, শুধু সুখটাই দেখছ, জ্বালাটা তো বুঝছ না। বেশ আছ তুমি স্বস্তিদি।

মনে মনে হাসলেন স্বস্তি। শুধু আমরা মেয়েরাই নই, কাঠ পুরুষরাও এসব কথার যথার্থ মানে জানে কৃষ্ণা। এ খেদোক্তি নয়, পোষা বেড়ালের মতো যারা সুখকে শিয়রে রেখে রাত কাটায় তারাই এ জ্বালার কথা এমন তরল স্বরে বলতে পারে। সত্যি জ্বালাকে আমরা ছেঁড়া শাড়ির মতো সামলে চলি। এ কথা মেয়েরা সকলেই জানে, তবু যুগ যুগ ধরে বলে। মেয়েরা বড় বোকা কৃষ্ণা।

সকালের মিটিং-এর প্রস্তাবগুলো সামনে টেনে নিয়ে কিছুটা নিরাসক্ত স্বরে বললেন স্বস্তি, সেতো সকাল থেকেই দেখছি। যা তো এবার, খেয়ে নে গিয়ে। না কি কর্তাকে ফেলে খাস না।

কৃষ্ণা একটু হেসে বেরিয়ে গেল। সেটা ইঙ্গিতটা মেনে নেবার হাসি, না

নিক্ষিপ্ত শরটা ভোঁতা বলে অনুকম্পার, ঠিক বোঝা গেল না। এর চেয়ে যদি ও রুখে উঠে বলত, এখনও অত কন্‌জারভেটিভ হয়ে উঠিনি, তাহলে মনে মনে খুশী হতেন স্বস্তি।

কৃষ্ণা বেরিয়ে গেলে কাগজগুলো ভালো করে গুছিয়ে নিলেন। সকালের ডেলিগেট মিটিংটা অসমাপ্ত আছে। কাল সকালেও জের চলবে। নিজেকে একটু ভালো করে প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। মফঃস্বল সহর হলেও বেশ কিছু শক্ত ও সচেতন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন এবার। এবারের কনফারেন্স দেখে বেশ খুশি হয়েছেন স্বস্তি। ভবিষ্যতে এদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাশের ঘরে বোধহয় ঘুমন্ত মেয়েটাকে ঠিক করে শোয়াচ্ছে কৃষ্ণা। চিরকালীন মায়েদের কপট বিরক্তি প্রকাশ করছে নিজের মনে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে কৃষ্ণার। অবশ্য ছেলেপেলের ঝামেলা এখনও খুব সহ্য করতে পারে বলে মনে হয় না। বড় ছেলেটাকে তো দিদিমার কাছেই রেখে দিয়েছে। মেয়েটা আর একটু বড় হলে হয়তো ঠাকুমার কাছে পাঠাবে। দুই দেবাদেবীর নিরিবিলি সংসারে হাত পা ছড়িয়ে দিন কাটাবে তারপর। আধুনিক মেয়েদের ফ্যাসানের ধাক্কা সামলাতে পারে নি কৃষ্ণাও। সেই কৃষ্ণা। দুঃখ বোধ করেন স্বস্তি।

দূর থেকে একটা ট্রেনের আলতো শব্দ আসছে। জানলার দিকে তাকালেন স্বস্তি। সামনে বিরাট কালো কার্পেট অন্ধকার মাঠ। ওপারের স্টেশনটা শীতে জড়োসড়ো. জন্তুর মতো এতটুকু হয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে। মিটমিট করছে অসহায় দুচারটে আলো। চুপচাপ অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বস্তি। অনেকদিন পর নিরিবিলি মুহূর্তে এমন অন্তরঙ্গ একটা রাত দেখছেন। ভালো লাগছে কিনা ঠিক বুঝছেন না, তবে মনটা যেন ভারী লাগছে। নির্জন প্রকৃতি মনগুলোকে পুতুল করে ফেলে। নির্জনতাকে তাই আজকাল এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন স্বস্তি। নির্জনতা মনকে স্মৃতিসঞ্চারী করে। স্মৃতিকেও আজকাল ভীষণ ভার মনে হয় স্বস্তির। কাজের চেয়েও ভার। যে কাজ আজ নামী জীবনের পটভূমি, ভিত্তি, সেই কাজের চেয়েও।

কড়া নাড়ছে কে ? সুব্রত এল বোধহয়। হ্যাঁ, কৃষ্ণা উঠে গেল। দরজা খুলল। নিচু গলায় দুজনের দুচারটে কি যেন কথা হলো। অন্যমনস্ক হবার

চেষ্টা করলেন স্বস্তি। স্বামী-স্ত্রীর আড়াল-কথা অনিচ্ছাসত্ত্বে কানে এলেও
কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। অস্বস্তি বোধ হয়। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে
ভাবেন স্বস্তি, কি কথা বলে ওরা। রোজ রোজ দিনের পর দিন, বছরের
পর বছর, রোজের দেখা হওয়া লোকের সঙ্গে কি এত কথা বলে মেয়েরা।

সুব্রত এদিকেই আসছে। সোজা এ ঘরে এল। স্বস্তি কাগজপত্রগুলোর
ভেতর ডুবে গেলেন।

হাসল সুব্রত, কাজ করছেন বুঝি? আচ্ছা করুন, ডিস্টার্ব করব না।
কোনো অসুবিধে-টিধে হচ্ছে না তো?

পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালেন স্বস্তি। সুব্রতর চোখের দিকে স্থির
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। সাধারণ মেয়েদের মতো ছেলেদের চোখে চোখ
রেখে কথা বলতে বিব্রত বোধ করেন না স্বস্তি। এই দৃষ্টি নিষ্পলক রেখে
ছেলেদের সমালোচনা করতে হয়। কাজ ভাগ করে দিতে হয়। কড়া হুকুম
দিয়ে সে কাজ অনেক সময় করিয়েও নিতে হয়। অথবা দোদুল্যমান কর্মীদের
সংশয় থেকে সরিয়ে কঠিন মাটিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে হয় এই দৃষ্টির
ঋজুতায়।

বরং সুব্রতই সামান্য বিব্রত হলো যেন। ঘন ঘন দুবার চোখের পাতা
ফেলল। খুশি হলেন স্বস্তি। জানেন, কৃষ্ণা লক্ষ্য করছে এ-দৃষ্টি আর
সুব্রতকে। একটু হাসলেন স্বস্তি—অসুবিধে বোধ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু
কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছি না। দুই স্বামী স্ত্রী মিলে সুযোগটা
থেকে বঞ্চিত করছেন আপনারা।

সুব্রত মুক্তি পেল। হেসে বলল, কি যে বলেন। আচ্ছা, আপনি কাজ
করুন।

যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল কৃষ্ণা। সুব্রতর বিব্রত মুখটার কথা
মনে করে হাসি পেল স্বস্তির। বোধহয় কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির। অথবা আমাদের
মতো ঋজু ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা আছে।
বিজনেসম্যান যখন তখন থাকতেও পারে। শুধু ব্যবসা আজ আর কজনের।

অথচ কৃষ্ণার মতো মেয়ে এই দুর্বল লোকটার টানেই পথ ছেড়ে ঘরমুখো
হলো। মেয়েদের মন বড় জটিল এবং দুর্বল। নিজে মেয়ে বলেই এ দুর্বলতার
স্বরূপ জানেন স্বস্তি।

আর একটা ট্রেন আসবে বোধহয়। স্মৃতির অন্ধকার তাঁবু থেকে ক্লান্ত

ঘণ্টার শব্দ গড়িয়ে আসছে। ক্লান্ত কিন্তু স্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ এবং ছন্দিত।
ছেলেবেলায় এই ঘণ্টার ইশারায় সেই গাড়িটা এসে সামনে দাঁড়াত, যে গাড়িতে
চড়ে নাম না জানা অনেক দূরের দেশে চলে যাওয়া যায়। যে ট্রেনটা থামতে
জানে না, শুধু চলে। যে ট্রেনে ঘুম ঘুম করুণ মুখের নীরব যাত্রীরা মাঠের
জোনাক জ্বলা আকাশের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। অথচ কোথায়
জানে না।

শেষ ঘণ্টার শব্দে সচেতন হলেন স্বস্তি। ছেলেমানুষের মতো এ সব কি ভাবছি। আমার হয়েছে কি। নাঃ, কৃষ্ণার এখানে এসে না উঠলেই ভালো হতো। সবার সঙ্গে ক্যাম্পে থাকলে অনেক কাজ এগিয়ে থাকত। প্রয়োজন হলে দু একটা ঘরোয়া বৈঠকেরও ব্যবস্থা করা যেত।

কৃষ্ণাদের খাওয়া হয়ে গেল বোধহয়। বাসন তোলার শব্দ হচ্ছে। দুদিন হয় ঝিটা নাকি আসছে না। বেশ মুশ্‌কিলে পড়েছে মনে হয় কৃষ্ণা।

আড়াই জনের সংসারের দায়িত্বে আজ বিব্রত, বিমুখ কৃষ্ণা। অথচ এই কৃষ্ণাই হাসিমুখে একদিন গোটা শহরের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ঘুরত। কি অদ্ভুত পরিশ্রমী ছিল মেয়েটা। কঠিন দায়িত্ববোধ। অথচ উচ্ছল। স্বস্তিরই সংগ্রহ ছিল কৃষ্ণা। স্বস্তির গর্ব। এ জন্য অবশ্য কৃষ্ণার বাড়ির ঝামেলা কৃষ্ণার চেয়ে ওঁর কম পোহাতে হতো না। বোধহয় সেই লজ্জাতেই স্বস্তির ছায়ার মতো হয়ে উঠল কৃষ্ণা। বয়সের অনেকটা ফারাক ছিল বলেই বোধহয় সহকর্মী কৃষ্ণাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করতেন স্বস্তি। বিপদে আপদে, দলের সমালোচনার হাত থেকে, সব সময় আড়াল করে চলতেন।

সেই জন্যই বোধহয় আজ মিটিং-এর পর কৃষ্ণা আচমকা উপস্থিত হয়ে এখানে এসে ওঠার আবদার ধরায় সেটা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। পুরনো তিক্ত কিছু স্মৃতি মুহূর্তের জন্য যে বাধা না দিয়েছিল তা নয়। কিন্তু কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করতে পারেন নি।

কৃষ্ণাকে আচমকা এখানে দেখে প্রথমে অবশ্য অবাক হয়েছিলেন স্বস্তি। বোধহয় বছর দশ-বারো বাদে দেখা। অজস্র মুখের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া মুখ।

তুমি এখানে?

মিষ্টি লাজুক হাসি হাসছিল কৃষ্ণা—বিয়ের পর থেকে তো এখানেই আছি।

ঝড় বয়ে যাওয়া উত্তপ্ত মিটিং থেকে সন্ত বেরিয়ে আসা নেত্রী স্বস্তি ততক্ষণে আবার নিজের ভেতর ফিরে গিয়েছেন। দেখে চিনেছেন এবং খুশি হয়েছেন, একদা পরিচিতদের এর চেয়ে আর বেশি কি দিতে পারেন উনি। দেবার সময়ই বা কোথায়।

স্বস্তি চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে পাশের স্থানীয় ভলেন্টিয়ার মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, এদের একটু বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে যাও তো, কাল সময় পেলে একবার যাবার চেষ্টা করব তোমার ওখানে।

মুহূর্তে ম্লান হয়েছিল কৃষ্ণা। সেই কিছু খোঁজার দৃষ্টিটা তুলে ধরেছিল স্বস্তির চশমা খোলা চোখের দিকে। তারপর আবদারে আবার সেই বহুদিন আগের কৃষ্ণা হয়ে উঠেছিল ও। স্বস্তির হাত টেনে ধরে চপল স্বরে বলেছিল, আজ তুমি যত বড় নেত্রীই হও না কেন, আমাদের কাছে তুমি সেই স্বস্তিদি-ই। আমি কোনো কথা শুনব না, তোমার যেতেই হবে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, অবশ্য তোমার যদি কোনো রাজনৈতিক আপত্তি না থাকে।

আর আপত্তি করতে পারেন নি স্বস্তি। কৃষ্ণার চোখ দেখে করুণা বোধ করেছিলেন বলে? কৃষ্ণা পুরনো, প্রায় নিজেরই ভুলে যাওয়া স্বস্তির হাত ধরে টেনেছিল বলে? নাকি ক্লান্ত নেত্রী একটু একক স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা মনে মনে কামনা করেছিলেন? ঠিক মনে করতে পারছেন না স্বস্তি, তবে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং ক্যাম্প থেকে এখানেই এসে উঠেছিলেন।

অক্ষরগুলো ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। মনকে বোঝালেন স্বস্তি, চোখের জন্যই ঠিক পড়তে পারছি না। চোখটা বড় কষ্ট দিচ্ছে কিছুদিন যাবৎ। শুধু চোখটাই বা কেন, গোটা শরীরটাই। শরীরের আর দোষ কি? ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলে। কিন্তু জানে না, দিনগুলো চল্লিশ ঘণ্টার হলে তবু বরং কিছু সময় পাওয়া যায়।

সিগারেটের গন্ধ আসছে। সুব্রত খাওয়া দাওয়া সেরে সিগারেট খাচ্ছে। নিজের কোনো নেশা নেই। নেশার বিরোধী স্বস্তি। তবু মাঝে মাঝে সিগারেটের গন্ধটা ছেলেদের গায়ে মিশে থেকে ওদের আকর্ষণ, না, আকর্ষণ নয়, ব্যক্তিত্ব বাড়ায় মনে হয়। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল কৃষ্ণা মশারি টানাচ্ছে। হঠাৎ কি হলো যেন স্বস্তির, কৃষ্ণার এ মুহূর্তের চোখ দুটো বড় দেখতে ইচ্ছে হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চমকালেন। কটা গোপন

সার্কুলার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। পড়ার সময় পান নি। উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে সার্কুলারগুলো বের করে আনলেন স্বস্তি।

কি একটা কথার উপর যেন কৃষ্ণা খিলখিল করে হেসে উঠেই হঠাৎ থেমে গেল। নিশ্চয়ই স্বস্তিদির কথা মনে পড়ায়। রাগ নয়, সস্নেহ অস্বস্তি বোধ করেন স্বস্তি। এখনও ওর ছেলেমানুষী গেলো না। দু ছেলেমেয়ের মা হয়েছে কে বলবে।

বাবা, এতদিন হয়ে গেল! অথচ মনে হয় যেন সেদিন। কৃষ্ণা যখন বিয়ের কথা বলল প্রায় চমকে উঠেছিলেন স্বস্তি। অথচ পরে ভেবে পান নি কেন অত বিচলিত হয়েছিলেন। নিজের অবচেতন স্বার্থের জন্যই কি?

ঠিক ভূমিকম্প না হলেও দলের ভেতর তখন ছোট ছোট কিছু কম্পন ঘটে গেছে। অবিশ্বাস্যভাবে কিছু পুরনো মুখ তাতে ছিটকে গিয়েছে পাশ থেকে। মুখের চেহারা বদলেছে কিছু পরীক্ষিত পুরোধাদের। কিছু নবাগত দলকে পেছনের পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজেছে নির্লজ্জের মতো। এসব দেখে ব্যথিত হয়েছেন স্বস্তি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন মাঝে মাঝে। পেছনে হেলাফেলা করে ফেলে আসা জীবনের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখেছেন, সত্যি সোনা এড়িয়ে এসেছেন, না সত্যি সোনার অন্বেষণেই এগোচ্ছেন। অত্যন্ত গোপনে মাঝে মাঝে ক্লান্ত মনে হয়েছে তখন নিজেকে।

কৃষ্ণার নিঃশব্দ সাহচর্য তখন সাহস জুগিয়েছে স্বস্তিকে। নতুন করে চলার শক্তি জুগিয়েছে। বয়সের ফারাক ভুলে কৃষ্ণার বন্ধু হয়ে উঠেছেন নিজের অজান্তেই।

কৃষ্ণাদের ঘরের জানলা-গলা আলোটা তেরছা হয়ে সামনের প্রাচীরের গায়ে লেপ্টে ছিল। হঠাৎ সেই আলোর ফ্রেমে দুটো মুখোমুখি ছায়া ফুটে উঠল। মনে মনে কেন যেন ভয় পেলেন স্বস্তি। মেয়েরা বিয়ে হলেই বড় বেহায়া হয়ে ওঠে। আলগা হয়ে যায়। আলো আড়াল করে দাঁড়ালে তার ছায়া পড়ে এবং সে ছায়ার প্রদর্শনী নিয়ে সোচ্চার প্রাচীর আরো অনেক জানলা থেকে দেখা যেতে পারে, এ কথাটা মনে থাকা উচিত ছিল কৃষ্ণার। স্বস্তি অস্বস্তি অনুভব করলেন। কেমন নতুন একটা অনুভূতি বুকের উপর চেপে বসছে যেন। আলোটা নিভিয়ে দিলেন স্বস্তি।

কৃষ্ণা বিয়ে করে সুখী হয়েছে এতে তো অসুখী হবার কোনো কারণ নেই স্বস্তির। তবু মনে হয় সকাল থেকে নিজের সুখটা বড় বেশি চোখে আঙুল

দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। মনে মনে হাসেন স্বস্তি। সেই শেষ কথাগুলো মনে রেখেছে বোধহয়। ওদের ঘর-বন্দী মন বলেই বোধহয় সব বন্দী থাকে ওদের মনে। কিন্তু স্বস্তিদের মন গড়িয়ে চলা পাথর, সেখানে শ্যাওলা জমে না।

হ্যাঁ, বাধা দিয়েছিলেন স্বস্তি। প্রথমে আড়ালে ব্যক্তিগত ভাবে, তারপর দলের তরফ থেকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ওকে ফেরাবার। রীতিমত বিশ্বাসঘাতকতা মনে হয়েছিল সেদিন ব্যাপারটাকে। সাত পুরুষে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব নেই, অতি সাধারণ এরকম একটি ছেলেকে নির্বাচন করাতে ওর রুচিকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। নিজেরই পরাজয় মনে হয়েছিল কৃষ্ণার এভাবে সরে যাওয়াতে। নিজেকে দুর্বল মনে হয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য কৃষ্ণার। মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। শুধু একবার মুখ ফুটে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না স্বস্তিদি। বেশ কিছুদিন হয় নিজেকে ভীষণ দুর্বল, ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। বিয়ের প্রশ্ন না এলেও হয়তো আমার সরে যেতে হতো। তুমি ভুল বুঝো না।

ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন স্বস্তি, তোমাকে ভুলই বুঝেছিলাম। একটা ঠুন্‌কো প্রেমের মোহ এড়াতে পারবে না, এতটা হালকা মনে হয় নি তোমাকে কোনোদিন। সুখের স্বর্ণমারীচের পিছে ছুটছ তুমি, তোমাকে এখন বাধা দেওয়া বৃথা।

চোখ নামিয়ে চলে আসার সময় বলেছিল কৃষ্ণা, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায় না স্বস্তিদি, জীবনে এ-দিন কোনোদিন এলে বুঝতে পারতে।

জানে না কৃষ্ণা পাকধরা চুলেই জন্মান নি স্বস্তি। চোখের স্বপ্ন আড়াল করা চশমার পুরু লেন্সের পর্দা শাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই চোখে ওঠেনি। সামনের বিসদৃশ উঁচু দাঁতদুটো এ্যাবস্‌কণ্ড করার সময় তুলে ফেলতে হয়েছিল, তাই বাঁধানো। স্বস্তিও জানেন, কেন ও কখন রিমঝিম বর্ষায় মন খারাপ হয়। প্রতীক্ষিত শিল্পীর জন্য মন সেতারের বাঁধা তার হয়ে বসে থাকে। নিজের ভার নিজের কাছে দুর্বহ মনে হয়।

ওরা আলো নিভিয়ে দিল। প্রাচীরের দিকে আর তাকান নি স্বস্তি। তাই জানেন না, জীবনের সব হরিণই স্বর্ণমারীচ নয়, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য ছায়া দুটো আরো ঘনিষ্ঠতায় সম্মিলিত একটি ছায়া হয়ে উঠেছিল কিনা।

জানলা দিয়ে বাইরের ঘুম ঘুম আকাশটা দেখা যাচ্ছে। মফঃস্বল শহর বড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। স্বস্তির মতো যাদের অনিদ্রা রোগ আছে তাদের তাই স্মৃতি ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ থাকে না নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার। অথচ নিঝুম নিঘুম প্রহরের প্রশ্রয় পাওয়া স্মৃতিরা যে কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক তা শুধু স্বস্তিরাই জানেন।

শোভনদাও তো বোধহয় কোনো একটা মফঃস্বল শহরেই অধ্যাপনা করছে। বহুদিন পর শোভনদার কথা মনে পড়ায় একটু অবাক হলেন স্বস্তি। অস্বস্তি বোধ করলেন। অথচ কৃষ্ণাটা কী বোকা! জীবনে এ-দিন কোনো-দিন এলে বুঝতে পারতে—কী অবলীলাক্রমে এত বড় একটা কথা অমন ভারিক্কী চালে বলে গেল সেদিন। সে-দিন যদি জীবনে নাই আসবে তাহলে শোভনের মতো ছেলে কেন কলকাতার কলেজ ছেড়ে নিঃশব্দে মফঃস্বল শহরে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নেবে। বছর দু-তিন আগে কার কাছে যেন শুনেছিলেন স্বস্তি, শোভন এখনও বিয়ে করেনি। জানে স্বস্তি কোনোদিন করবে না। সেখানেই ওর জয়।

কৃষ্ণারা শুয়ে পড়েছে বোধহয়। মাঝের দরজাটা তো খিল দিয়ে শোয়া হলো না। হাওয়ায় খুলে যাবে না তো আবার? ভীষণ লজ্জা পেতে হবে তাহলে। অথচ খিল দিতে যেতেও লজ্জা লাগছে। খিলের শব্দটা একই রাতের দু-ঘরের পূর্ণতা ও শূন্যতার ফারাকটাকে বড় বেশি সশব্দে ঘোষণা করবে হয়তো। বরং ওরা ঘুমাক, তারপর দিয়ে দেওয়া যাবে।

পাশ ফিরে শুলেন স্বস্তি। বিছানাটা হাত বুলিয়ে দেখলেন। দুটো তোষক দিয়েছে। আথিত্যের কোনো ত্রুটি রাখেনি কৃষ্ণা। বরং যেন বাড়াবাড়িই করছে। না কি আসল সুখকে মানুষ এভাবে ঘোষণা করেই সুখ পায়?

সকাল থেকেই ওর এই সুখ প্রদর্শনীটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন স্বস্তি। কারণে অকারণে বারে বারে পুরনো দিনের কথা তুলেছেন—তোকে যেদিন প্রথম এ্যারেস্ট করল সেদিনের কথা মনে আছে কৃষ্ণা? আমাদের জেল হয়ে গেল, তোদের কোর্ট থেকেই ছেড়ে দিল। অথবা, সেই মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলির দিনটা মনে আছে তোর? বাবাঃ, কি রকম কানের কাছ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা। এবং এ রকম আরো অনেক প্রসঙ্গ।

বলেছেন আর তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেছেন কৃষ্ণাকে। কিন্তু কৃষ্ণা নির্বিকার। নির্মল তৃপ্ত হাসি নিয়ে ও সাধাসাধি করছে, ঐ সন্দেশটা তুমি কিছুতেই ফেলতে পারবে না স্বস্তিদি। ওকি, সব মাংসটুকু ঢেলে নাও। এত কাজের ভেতরও কর্মচারী না পাঠিয়ে ও নিজে বাজারে গিয়ে বেছে নিয়ে এসেছে।

আরো অনেক গল্প করেছে কৃষ্ণা। সুখের গল্প। আর মাঝে মাঝে সেই কি যেন খোঁজা দৃষ্টি মেলে ধরেছে স্বস্তির চোখে। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, তোমরা বেশ আছ স্বস্তিদি।

ওরা এখনও গল্প করছে। গুনগুন একটা সুরের তরঙ্গ ভেসে আসছে শুধু, কথাগুলো শরীরী হয়ে উঠছে না! এত কি কথা বলে ওরা। ওরা কি ক্লান্ত হয় না? ফুরিয়ে যায় না। বিয়ের আগেও কি মেয়েরা এত কথা বলে।

আস্তে উঠে ফ্যানটা বন্ধ করে দিলেন স্বস্তি। সারারাত ফ্যানের তলে থাকলে গা ভারী হবে। ইদানিং সামান্য বাতের গোলমাল টের পাচ্ছেন।

জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। করুণ ক্লান্ত তারা ছিটানো আকাশ। আর আকাশ মাটির সীমানার সেই স্মৃতির কালো তাঁবু স্টেশনটা।

গুনগুন কথাগুলো এখনও গানের রেশের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। মাঝে মাঝে কথাগুলো থেমে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন কতগুলো টুকরো শব্দে মিশে যাচ্ছে। এবার অস্বস্তির চেয়েও বেশি রাগ হলো স্বস্তির। এমন বেহায়া কেন মেয়েটা। বয়সের প্রাপ্য সম্মানটুকু যদি নাও দিস, অন্তত অবিবাহিত একজন মহিলা এঘরে শুয়ে আছে সেটাও তো স্মরণ রাখা উচিত। নাকি সেদিনের প্রতিশোধ নেবার জন্যই আজ কোমর বেঁধে লেগেছে মেয়েটা। ওর সারাদিনের কি যেন খুঁজে ফেরা কৌতূহলী দৃষ্টিটার মানে এতক্ষণে পরিষ্কার হয় স্বস্তির কাছে।

কেমন একটা বিকৃত শব্দ করে ঘড়িতে একটা বাজল। ওরা থামল। রাত হয়েছে বলে না ক্লান্ত হয়ে, কে জানে। এতক্ষণে যেন মুক্তি পেলেন স্বস্তি। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

জাগ্রত মনও অনেক সময় অন্যমনস্কে ভাবে। যুক্তিবহ সূত্র ধরে এগোয় না চিন্তা, কিন্তু আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েই থাকে মনকে। ঘড়িতে দুটো বাজলে

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন স্বস্তি, এতক্ষণ অন্যমনস্কে এলোমেলো কি যেন সব ভাবছিলেন। এত শাসনের তাঁবে রাখা মনও আজ মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগে জীবনে কি পাইনি তার হিসেব মিলাতে বসেছিল। মনকে শাসনের শক্তি কি হারিয়ে ফেলেছেন স্বস্তি? না হলে এত সচেতন হয়েও এ হিসেব, এতদিন পর, আবার নতুন করে মিলাতে বসলেন কেন? ক্লান্ত বলে? হ্যাঁ, ক্লান্ত। এতদিনে নিজের মনের দিকে, দেহের দিকে আবার নতুন করে ফিরে তাকালেন স্বস্তি। ক্লান্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলার ক্লান্তি দেহে মনে। কিন্তু কোথায় ছুটছেন? কোন লক্ষ্যে? নাকি সার্কাসের বাঘের মতো শুধু চক্রাকারে অন্তহীন পরিধি ধরে ছুটে চলেছেন? পেছন থেকে অদৃশ্য হাতের চাবুকের শব্দ ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এমন করে। চাবুকের মতো তীব্র কিন্তু মিষ্টি শব্দ! জয়ধ্বনির মতো, হাততালির মতো শব্দঝঙ্কার।

ওরা আবার কথা শুরু করেছে। অসহ্য। শব্দ করে মাঝের দরজার খিলটা তুলে দেবেন? দিয়ে লজ্জা দেবেন ওদের? যদি ওপারে স্বামীর পাশে শুয়ে অনুকম্পায় হাসে কৃষ্ণা, খিল দিলেই কি এত সহজে দরজা বন্ধ করা যায় স্বস্তিদি! দরজা যদি খুলেই থাকে, তাকে খুলতে দাও। এখনও সময় আছে, বন্ধ করো না।

অবাক হয়ে নিজের মনের দিকে ফিরে তাকালেন স্বস্তি। আমি কি ঈর্ষা করছি? জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে কৃষ্ণার সুখকে ঈর্ষা করছি?

ওদের গুনগুন আলাপ এবার শব্দের শরীর পেল। চেষ্টা করলে যাকে চেনা যায়, ধরা যায় হয়তো। পাশ ফিরে শুলেন স্বস্তি। অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করলেন। বোধহয় নতুন তোশক। বেশ নরম। কিন্তু এত নরম শয্যাকেও আজ যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হচ্ছে স্বস্তির।

কথার শরীর আরো স্পষ্ট হলো। দ্রুত খাটের উপর উঠে বসলেন স্বস্তি। আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রীতিমতো অপমানকর এটা। দৃপ্ত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্বস্তি।

কিন্তু খিলে হাত দিয়েই থমকে থেমে গেলেন। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার পাশে।

তাবলে এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেবে?

কৃষ্ণা স্তিমিত কণ্ঠে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল, তোমার তো কোনো ক্ষতি করিনি।

সুব্রতর স্বরে উষ্মা—হ্যাঁ, করেছ। আমি যা নই স্বস্তিদির চোখে সেই পরিচয় তুলে ধরে আমাকে বিব্রত করেছ, অপমান করেছ। কেন তোমার বলতে বাধছিল তোমার স্বামী বিজনেসম্যান, কিন্তু সে শুধু ছোট্ট একটা স্টেশনারী দোকানের দৌলতে। কেন বলতে পারলে না ছেলেকে ইচ্ছে মতো মানুষ করার সামর্থ্য নেই বলে দিদিমার কাছে রেখেছ। বাধ্য হয়ে তুমি স্কুলে চাকরি নিয়েছ। তোমার দু-দিন অনুপস্থিত ঝি কোনো দিনই উপস্থিত থাকে না। নিজের অজান্তে নিজেকেও তুমি কতবড় অপমান করেছ জানো ?

সঙ্গে সঙ্গে একথার কোনো জবাব দিল না কৃষ্ণা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাদের সব কথা তুমি বুঝবে না। পুরুষ মানুষ বলেই বুঝবে না। স্বস্তিদির কাছে আমার পরাজয়কে তুলে ধরে ওঁর অনুকম্পার পাত্রী হতে চাইনা আমি। নতুন করে পরাজয়কে ডেকে আনতে চাই না। খুব বড় মুখ করে স্বস্তিদির নিষেধ ঠেলে একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম।

এ-কথার কোনো জবাব দিল না সুব্রত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ক্লান্ত স্বরে বলল, যাক, এবার ঘুমানো যাক। তুমি ভুল করেছ. নতুন করে আবার সেকথা শুনে রাত জাগার কোনো মানে হয় না।

করুণ কণ্ঠে বলল কৃষ্ণা, ভুল বুঝো না। তোমার ক্ষেত্রে কোনো ভুল করিনি, কিন্তু নিজের সুখটা বেশি বড় করে চেয়েই ভুল করেছিলাম। স্বস্তিদিকে দেখে হিংসে হয়।

সামান্য সময়ের ব্যবধানে সুব্রতর ছোট্ট হাসি শোনা গেল। ছোট ছোট কটি কথা। এবং সন্ধির আরো কটা আনুসঙ্গিক শব্দ। অন্ধকারেই কান দুটো লাল হয়ে উঠল স্বস্তির। এবং নিজের উপর ধিক্কার এল। ছি ছি, এত অসহায় মেয়েটাকে হিংসে করছিলাম।

গানের সুরের মতো আবছা স্বর ভেসে এল কৃষ্ণার, আঃ, কি করছ ? বিছানার চাদরটা চুড়িতে বেজে আরো ছিঁড়ে গেল। কাল একটা বিছানার চাদর এনো। এটা না পাল্টালে আর চলছে না।

অনেকদিন পর আবার নতুন করে সেই পুরনো কৃষ্ণার মুখ ভেসে উঠল স্বস্তির চোখের সামনে। যাকে স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন, শাসন করতেন। তৃপ্তির হাসি নিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে এলেন স্বস্তি। বোকা মেয়ে! ঐ একটা বিছানার চাদর বদলালেই কি শরশয্যা পুষ্পশয্যা হয়ে ওঠে। সেজন্য আরো অনেক কিছু পাল্টাতে হয়। ঘর, দেশ, সমাজ।

খুট্ করে আবার আলোটা জ্বালালেন স্বস্তি। কালকের প্রস্তাবগুলোর উপর কিছুটা প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়। মফঃস্বল সহর হলেও কিছু শক্ত আর সচেতন প্রতিনিধি এসেছে এবার কনফারেন্সে।

যাত্রার দিনের কথা

অরুণা হালদার

যাত্রার দিনের কথাই লিখছি : ১৯৬২ সালের ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবারের কথা।

অবশেষে সত্যিই এইরোফ্লোট ·054 বিমান ছাড়ল। বেলা তখন দেড়টা, ছাড়বার সময় ছিল আটটা। কখন সেই ভোরে উঠেছি। বান্ধবী রেণু চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী শ্রীনিখিল চক্রবর্তী আমাদের আগেই পালাম বিমানবন্দরে রওনা হলেন—রেণুদি যাবেন কলকাতা; তাঁর প্লেন আরও আগেই ছাড়বে। নিখিলবাবু তাঁকে তুলে দিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নয়া দিল্লীর পথে তখনো শীতের সকাল প্রায় লেপ মুড়ি দিয়ে আছে। আমরা তার মধ্য দিয়েই পালাম পৌছলাম—একটু বিলম্বই হয়েছে। তখন সাড়ে ছটা। তবে শুনলাম—প্লেন ছাড়তে একটু দেরি হবে, কারণ তাশখন্দের আকাশ তখনো অপ্রসন্ন। আমাদের যাত্রাদেশ নটায়। সোভিয়েত দূতাবাসের প্রতিনিধি ও 'মার্কারি ট্র্যাভ্‌ল্‌স্'-এর শ্রীযুক্ত হরদেও সুন্ধ মালপত্র সব ওজন করিয়ে আমাকে শুদ্ধ পাঠিয়ে দিলেন প্রতীক্ষাগারে। আমার আগেই সেখানে অপর যাত্রীরা এসে জড়ো হয়েছেন। ঘরে একটি আসনও খালি নেই—বসবার উপায় দেখলাম না। একটু পরেই শুনলাম—নটায় নয়, দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তাশখন্দের আবহাওয়া এখনো বিরূপ। নিখিলবাবু ও শ্রীযুক্ত সুন্ধু এবার বাড়ি ফিরে গেলেন। সেই প্রতীক্ষাগৃহে আমার জন্য রইলেন আমার স্বামী। বিমান বন্দরের আর একটি বাঙ্গালী কর্মচারীও মাঝে মাঝে আসছিলেন। প্রিয়ভাষী যুবক। তাঁর কাজ যাত্রীদের দেখে-শুনে প্লেনে তুলে দেওয়া। এখন যারা রইলাম তারা সবাই যাত্রী—কেবল আমার স্বামী ও মঙ্গোলীয় দূতাবাসের দুটি ভদ্রলোক ছাড়া। তাঁরা যাত্রীদের তুলে দিতে এসেছেন। ঘর লোকে ভরতি—যেমন করে হোক একটু বসবার স্থান সংগ্রহ করতে হলো। যাত্রীরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছু পরেই দেখলাম আরেকটি ভারতসন্তানও যাত্রী

আছেন। দেখেই বুঝলাম—তিনি তামিল হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তা অর্ধসত্য। তিনপুরুষ আগে তাঁর পিতামহ ভারত ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করে পিতা বাস স্থাপন করেছেন ব্রিটেনে। যুবকটিরও জন্ম সেখানে। এই প্রথম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। হ্যাঁ, তাঁর স্বদেশও ; কারণ তিনি তামিল ভাষা জানেন। তবে ভারতে এসেছিলেন বিশেষ করে একটি বিদেশীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে। তাঁরা এখানে গান্ধীজীর শেষজীবনের ছবি তৈরি করছেন। ছবি সম্বন্ধে আমার উৎসাহ বিশেষ নেই, তবে যুবকটিকে মন্দ লাগল না—তিনপুরুষ বিদেশে থেকেও যাঁরা মাতৃভাষা ভোলেন না তাঁদের সম্বন্ধে একবার একটু কৌতূহল বোধ করেছি।

অবশ্য কৌতূহল বোধ করবার মতো আরও অনেক বিষয়ই সেখানে ছিল। আমরা বোধহয় বত্রিশজন যাত্রী। অনেকেই যাচ্ছেন মস্কোতে। কেউ কেউ তাশখন্দে নেমে সেখান থেকে যাবেন হয় আলমা আতা, নয় উলান বাতোর—একটি কাজাকাস্তানের প্রধান শহর, অপরটি বহির্মঙ্গোলিয়ার। আসলে খাঁটি মঙ্গোলীয় যাত্রী ছিলেন একজনই। তিনি নয়াদিল্লীর দূতাবাসে কয়েক বছর কাজ করেছেন, এখন দেশে ফিরছেন। প্রিয়দর্শন যুবক, ইংরেজি জানেন। দেখলাম, তিনি আমার স্বামীর পরিচিত। নবেম্বর মাসের রবীন্দ্রমেলায় তিনিই তাঁর দেশের পক্ষ থেকে সেই উৎসবে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমিও তাঁকে তখন দেখেছি দূর থেকে। এখন পরিচয় হলো, আলাপও হলো। কিন্তু আলাপের মন আমার তখন নেই ; কৌতূহলও আমার মনে তখন স্তিমিত। দেখছিলাম—তাঁরা সকলেই বাড়ি ফিরছেন। রুশীয়রা অনেকেই ভিলাই বা অন্য কোনো সোভিয়েত-প্রারব্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন। এখন দেশে যাচ্ছেন—পরিবার-পরিজন সঙ্গে। কারও কারও সঙ্গে ছেলেপিলেও। সকলেই হাসি-খুশি। উৎসাহ ও আনন্দ তাঁদের চোখে-মুখে। কথায়ও তাঁরা মুখর—যদিও সে ভাষা আমার অজ্ঞাত। তবু সেই আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করা যায়। আমার মনটা কেবলই নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছিল—আমি যাচ্ছি দেশ ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে। কথাটা ভুলে থাকতে আমিও চেষ্টা করছিলাম, আমার স্বামীও তা বুঝেই চাইছিলেন সব বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে। সত্যিই তো, সহযাত্রীদের সাজ-পোশাক, কথা-বার্তা, রূপ-গুণ যা

দেখছি, তা তো নিতান্ত পরিচিত জিনিস নয়। অনেকেরই গায়ে যা শীতবস্ত্র, তা দেখবার মতো—আরও অনেকের সঙ্গে বা আসনের পাশে তা গুছিয়ে রাখা। ভারতবর্ষ থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন কেউ ফার-এর কোট, অনেকেই জুতো, চামড়ার দামী ব্যাগ, সুটকেশ—ওদেশের তুলনায় সস্তা। পরিচ্ছদের পারিপাট্য তবু তাদের কম। কেবল দু-টি তরুণীকে মনে হবে তার ব্যতিক্রম—দু-জনাই সচেতন তাঁরা রূপসী। এবং সত্য কথা বলতে গেলে, সে রূপকে আমারও অবজ্ঞা করবার সাধ্য নেই। একজনকে তো বলতে হয় অসামান্যা সুন্দরী, আরজনও তাঁরই প্রায় সমতুল্যা। কেবল বয়সটা বোধহয় বছর পাঁচ বেশি। কিন্তু রূপের বয়স তাঁরও যায় নি, আর তিনিও তা জানেন। এঁরা কোন্ জাতীয়, কোন্ দেশীয়, কোন্ কুলোদ্ভবা তা আমার জানা নেই। রুশ মেয়ে যাঁদের দেখেছি তাঁদের এতো সৌন্দর্য দেখি নি—সৌন্দর্য বিষয়ে এই সচেতন চর্চাও তাঁদের মধ্যে ততটা নাকি সুলভ নয়। তন্বী, গৌরী, অপূর্ব নাক চোখ, মুখের শ্রী, দেহের যৌবনলাবণ্য—য়িহুদী নয়, কিন্তু জর্জীয় বা আর্মেনীয়ও মনে হয় না কেশদামে। সোনালী চুলের রাশি ছড়িয়ে একজনা একটি সোফায় নিমীলিত-নেত্রী। নিদ্রাতুরা কিনা কে জানে? মাঝে মাঝে কিন্তু চোখ খুলছেন, আর পাশের সঙ্গী যুবকটিকে লীলাভরা সপ্রেম দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করতে ভুলে যাচ্ছেন না। এ দৃষ্টিতে ধূর্জটি বেসামাল হবার কথা। তাতে কোনো পুরুষজাতীয় মানুষের পুরুষজাতীয় জীববৎ ওই পদতলে লুটিয়ে পড়া ছাড়া পথ থাকে না। দোষ কি যুবকটির—যখন সে মনে হয় স্বামীও—যদি সোফার পার্শ্ববর্তিনীর জন্য আপনার পৌরুষ-মহিমা ভুলেই থাকে? অপরা সুন্দরী মাঝে মাঝে আসন ছেড়ে উঠছেন—সামনের বারান্দায় গিয়ে বিমান ক্ষেত্রের এদিক-সেদিক দেখছেন। তাঁর দয়িতটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠছেন, পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন ; আবার রূপসীর পেছনেই ফিরে এসে তাঁর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করছেন। অশোভনতা কারও আচরণেই ছিল না। কিন্তু কৌতূহল থাকলে এই জীবন-রঙ্গের ক্ষুদ্র দৃশ্যটি কি উপভোগ করা যেত না! সেই কৌতুকেরই যে আমার অভাব—আমার মনের মধ্যে একটা সত্যই স্পষ্ট—ওরা বাড়ি যাচ্ছে, আমি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি।

ওদিকে এগারোটা বেজে গেল—বাইরে বিমানক্ষেত্রে দু-একটা বিমান এলো, কলকাতার, বোম্বাই-এর বা অমনি কোথাকার। দু-একটি আবার ছেড়েও

গেল। আমাদের প্রতীক্ষাগৃহের প্রতীক্ষাকাল বেড়েই যাচ্ছে। পালাম
বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ জানালেন—এখান থেকেই আমাদের ব্রেকফাস্ট
খেয়ে নিতে হবে। সেই ভোরে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে বাড়ি থেকে
বেরিয়েছি; জানা ছিল আকাশেই আমাকে প্রাতরাশ করতে হবে।
এখন এগারোটায় এখানে এ ব্রেকফাস্টের আহ্বানে আগ্রহ বোধ করলাম
আমরা দু-জনাই। আমি ও আমার স্বামী। আমার সঙ্গে তিনিও
নগদমূল্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে গিয়ে বসলেন। কিন্তু যে খাদ্য পরিবেশন করা
হলো আমার পক্ষে তা অস্পৃশ্য, ওঁর পক্ষে তা অনুপাদেয়। এক পেয়ালা
কফি ও দু-চামচ দুগ্ধযোগে যে ভুট্টার চিঁড়ে উদরস্থ করব ঠিক করলাম, তাও
খাবার টেবিলে মাঝপথে দুবার ফুরিয়ে গেল—ভিনদেশী, ভিনভাষী
অতিথিদের তাতে আরও বিপদ। দু-এক চামচ শেষ পর্যন্ত যা পেলাম তা
খেয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারা সম্ভব হতো না। কিন্তু
ক্ষুধা থাকলেও আমার খাদ্যগ্রহণ করবার মতো আগ্রহ বেশি ছিল না।
সেখানে আমার পরিচয় হলো যাঁদের সঙ্গে তাঁরা কেউ দেখলাম কাজাক নারী
পুরুষ, দু-একজন উজবেগও। তাঁরা এসেছিলেন ভারতভ্রমণে, আবার
একজন ভাঙা-ইংরেজি জানা অধ্যাপক জাতীয় ভদ্রলোক গিয়েছিলেন আরও
পূর্বদেশে কি কাজে। ভ্রমণকারীরা দেখলাম বেশ উৎসাহী, পারলে আলাপ
করেন—কিন্তু কার ভাষা কে বুঝব?

প্রতীক্ষাগৃহের বাইরের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিলাম শীতের রৌদ্রে।
আর এক বেঞ্চে সেই প্রণয়মুগ্ধ তরুণ-তরুণী দুটি—এক বেঞ্চে দু-জনায়
পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি। এমন পরিস্থিতিতেও আর আমার কৌতূহল নেই।
বারোটার পনের মিনিট আগে এমনি সময়ে সংবাদ এলো—দেবতা তাশখন্দের
প্রতি প্রসন্ন। অতএব, আমারও পালাম বন্দরের পালা হলো শেষ। পাঁচ
মিনিটের মধ্যে অন্যেরা তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে প্লেনের দিকে ছুটলেন,
সে বোঝা গুছিয়ে আমিও তাঁদের পিছু নিলুম—পেছনে ফেলে আসতে হলো
অপেক্ষমান আমার ঘরদুয়ার, একজোড়া চোখ। অনভ্যস্ত শীতের জুতোয়,
শীতের বস্ত্রে সাবধানে পা ফেলে যেতে যেতে একবার পেছনে না ফিরে
তবু পারি নি—দেখলাম রেলিং-এর ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী—
মুখে তখনো হাসি ছিল কিনা কে জানে।

একা আমি ভারতীয় মেয়ে, প্লেনের গহ্বরে প্রবেশ করছি। সেই

মঙ্গোলীয় অধিকারিকটি আমাকে ছাড়পত্র দেখানো, টিকেট দেখানো প্রভৃতি
বিষয়ে সাহায্য করছিলেন, বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আরও দু-জন ভারতীয়
এগিয়ে গেলেন দেখলাম; সকলে তাঁদের সসম্মানে এগিয়ে দিলেন। আগে
শুনেছিলাম আমাদের মস্কোর রাজদূতও এই প্লেনে মস্কো ফিরছেন। তিনি
সদলে প্রতীক্ষাগারে অপেক্ষা করছিলেন। এখন বুঝলাম—এঁরাই বোধহয়
তাঁরা—রাজদূত ও তাঁর সঙ্গী। আর একবার দূরের অপেক্ষমান মুখটির দিকে
ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। প্লেনের অভ্যন্তরে ঢুকে নির্দেশমতো আসনে গিয়ে
বসলাম—দূরের রেলিং-এর ধারের মুখ দেখা যায়। কিন্তু কি হলো, প্লেন
ছাড়ে না কেন? নিয়ম জানি না, ছাড়তে এমনই কি দেরি হয়?
পার্শ্ববর্তীরা কি বলছেন, তা বোঝা আমার অসাধ্য। বুঝতে চাইছিও
না। জানালা দিয়ে সেই প্রতীক্ষাগৃহের আঙিনার রেলিং-এ অবস্থিত
মানুষটিকে আমি দেখছি, তিনিও নিশ্চয় দেখছিলেন, আর কিছুক্ষণ পরে
কেউ কাউকে দেখতে পাব না—এমনি চিঠির অক্ষরে ছাড়া। অনেকক্ষণ
গেল। প্লেন কিন্তু নড়লও না। পরে শুনেছিলাম—পালাম বন্দরে বেলা
একটায় কে একজন বিদেশীয় অতিথি আসছেন, তাই বারোটা থেকেই এই
বন্দর অন্য বিমানের পক্ষে বন্ধ। সম্ভবত একটায় সেই অতিথি এসেছিলেন,
অন্তত দেড়টায় আমাদের বিমান যাত্রাদেশ পেল। তাশখন্দে জলঝড়ে দেরি
হলো চার ঘণ্টা, আর দিল্লীর অভ্যর্থনার উদ্যোগ পর্বে দেড় ঘণ্টা—সাড়ে
পাঁচ ঘণ্টা পরে এ্যারোফ্লোটের 'তু-১০৪' অবশেষে যাত্রা করলে।

জেট প্লেন যাত্রার পূর্বে প্রেতিনীর মতো নাকিস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছে।
তা নড়তে চড়তে শুরু করল, তারও পরে তা চলতেও আরম্ভ করল।
আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে পোর্টহোলের মধ্য দিয়ে আমার
স্বামীকে তখনো দূরে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলাম। অত বেলায়
মাথায় প্রখর রোদ; শ্রান্ত অভুক্ত অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু
প্লেন একটু গিয়েই মোড় ঘুরল, তিনিও দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। আরও
খানিকটা গিয়ে রৌদ্রভরা বিমানক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে প্লেনখানা বিমানবন্দরের
দিকে মুখ ঘোরাল। সেখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ সগর্জনে দম নিলে,
এবং মিনিট তিন দম নিয়েই রানওয়ে ধরে দিল ছুট। দু-দিকে খোলা-
মাঠের খর্বিত গাছপালা ফেলে বুঝলাম মাটি ছেড়ে উঠে গিয়েছি—নিচে
তাকাতে না-তাকাতেই প্লেন বিমানবন্দরের বাড়িকে দক্ষিণে অনেক নিচে

রেখে ঝড়ের বেগে উঠে গেল। এক পলকের মধ্যে পালাম এয়ারপোর্টের সকল দৃশ্যসমেত আমার পরিচিত মুখও অদৃশ্য হয়ে গেল। নিচে শুধু দিল্লীর উষর ক্ষেত্রের প্রান্তর। অনুভব করলাম তা ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠছি—চকিতের মধ্যেই আমার পরিচিত মাটি, পৃথিবী মিলিয়ে গিয়ে থাকবে।

এবার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল—মানবীয় দুর্বলতা এখন আর কোনো বাধা মানল না। বুঝলাম, শুধু পরিচিত প্রিয়-মুখই নয়, ভারতবর্ষের আলো হাওয়া আকাশও আমার কত প্রিয়। ছোটবেলা থেকে সে-ই তো আমার জ্ঞানের ভূমি, ধ্যানের আকাশ। বাস্তবে কেন, চিন্তায়ও কি আমি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছি? ভারতবর্ষ তো শুধু একটা মাটি-জলের বস্তু নয়, সে একটা অনুভূতিও। তার মাটিকে ছাড়তে না-ছাড়তেই সে অনুভূতির প্রতিটি সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে তীব্র বেদনার অনুরণন উঠল। কিছুক্ষণ পরে,—কতক্ষণ জানি না—একটি স্নেহস্পর্শ অনুভব করলাম স্কন্ধে, আর সহৃদয় কণ্ঠের জিজ্ঞাসা এলো কানে "Why do you cry?" চোখ খুলে দেখলাম বিমান-সেবিকা, এয়ারহোস্টেস্। লজ্জিত হয়ে নিজেকে সংযত করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বিদেশিনীর ভাষা আড়ষ্ট, কিন্তু স্পর্শটুকু সহানুভূতিভরা—ভারতের মাটি ছেড়ে অজ্ঞাত পৃথিবীর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। এ পরিচয় সাধন করলেন যিনি তাঁর নামও জানি না, কিন্তু ওই স্পর্শ, ওই স্নিগ্ধ সহৃদয়তাতেই তিনি আমার কাছে এনেছেন নতুন পৃথিবীর পরিচয়।

প্লেন এক-একবার যে অসম্ভব উঁচুতে উঠছে, তা বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে শুধু দেখছি দুই পাশে মেঘ, নিচেও মেঘ—উপরে জ্বলন্ত সূর্য। তীব্র শব্দ প্লেনের অভ্যন্তরে। আমার কান ব্যথা করতে লাগল। মাথা ভারী হয়ে উঠছিল। পূর্বে যে বিমানে চড়েছি সে কলকাতা-গৌহাটিগামী 'ডাকোটা', অনেক তা ছোট—তাতে অসুবিধে বিশেষ বোধ করি নি। জেট প্লেনের সঙ্গে আমার পচিয় এই প্রথম। প্রেসারাইজড প্লেনের ভেতরটায় আমার কেমন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। শুনেছি সকলের এরূপ হয় না—কিন্তু আমার হলো। কোথায় পৌছেছি জানি না। মাথা হেলিয়ে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম হিমালয়ের শৈলমালা। চিরতুষারমৌলি কোন্ নগাধিরাজ আর এমন আপনাকে বিস্তার করে দিতে পারে? কিন্তু এও

দূরে সেই গিরিশৃঙ্গের তুষাররেখা, যে, মনে হলো এই জেট প্লেনের যাত্রীদের চোখে সেই মহিমা হারিয়ে দেখা দিয়েছে পাঠ্যপুস্তকের চুনকাম করা গিরিগোবর্ধন রূপে। মাথায় শাদার ফেনা, না হলে কালো বা রাঙা পাহাড়ের স্তর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে আছে দূর থেকে দূরে। দেখবার মতো জিনিস হিমালয়, আলমোড়ায় আমি তাকে যেরূপে দেখেছি তা যেন অনেক নিকটের। ভাববার মতো জিনিসও হিমালয়—আমাদের চেতনায় শত সাধক-তপস্বীর ধ্যানের আশ্রয়রূপে হিমালয়ের একটা পবিত্র মহান্ রূপ ভাস্বর হয়ে আছে। সাধ্য কি হিমালয়কে আমরা একটা পর্বত বলে ভাবি—আল্‌প্‌স বা এ্যাণ্ডিস-এর মতো। সে 'দেবতাত্মা' নগাধিরাজ।

হিমালয় মিলিয়ে গেল—অন্তত চারদিকে মেঘ ঘিরে এসেছে। সেই মেঘের স্তরের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ, অদ্ভুত উজ্জ্বল নীল। যাত্রীরা কেউ পড়ছেন। কেউ পাশের যাত্রীর সঙ্গে গল্প করছেন। আমার পক্ষে দুই-ই অসম্ভব; ভাবনার শক্তিও মনে হচ্ছে শেষ। বর্তমান বাদ দিয়ে আগে পরে চিন্তা করতে পারলাম না। মেঘ যেন আমারই মাথার চারদিকে ঘনিয়ে আছে।

সামনে খাবার দেওয়া হলো। আহার্য সংরক্ষিত আধারে করে প্লেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; এয়ার হোস্টেস্‌রা তা কতকটা গরম করে, সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করছেন। আসনের সামনে সংলগ্ন করে আঁটা হয়ে গেল খাবার ট্রে—তাই টেব্‌ল। তাতে ছুরি-কাঁটা ছাড়া আছে রুটি, চীজ, বিস্কুট, মটরশুঁটি ও সব্জি। আর পক্ব শুকর মাংস জড়ানো শশা, আর সব শেষে কিছু ফল। অবশ্য পানীয় আছে লেমন-চা ও মিনারল ওয়াটার। আমার পক্ষে চা রুটি চীজ ও ফলই গ্রাহ্য। মাংস আমি অতি সামান্যই খাই। কিন্তু মাংসের গন্ধ যে এত উৎকট হতে পারে তা আগে কখনো মনে হয় নি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেতে বসে 'হেম্‌' চেখে না দেখলেও চোখে দেখেছি—কিন্তু এমন বিরাগ বোধ করি নি। বুঝলাম, মাছমাংস আমার পক্ষে বিদেশে বর্জনীয়। প্লেনেও সামান্যই খেতে পারলাম—খাদ্যে মন নেই বলেই বোধ-হয়। প্লেন তখন কোথা দিয়ে যাচ্ছে জানি না—হয়তো আফগানিস্তান-তাজিকস্তান পেরিয়ে, হিন্দুকুশ ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। প্রখর রৌদ্র-প্রদীপ্ত বালুরঙের পর্বতের তরঙ্গরাজি চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত—তরুলতা-গুল্মের চিহ্নও নেই। অন্তত ক্ষীণ শ্যামলরেখাও চোখে পড়ে না। মেঘচ্ছায়া এখানে সেখানে,

কিংবা মেঘেরই পাহাড়। এমনি অঞ্চল দিয়েই ভারতে আসত শক হূণ দল পাঠান মোগল—কোন্ তাড়নায় আসত তারা? সে সব পথ হয়তো আজও আছে যে পথে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যাতায়াত করতেন—যাঁদের দার্শনিক বিচার আমাকে বিস্মিত করে। কিন্তু এই পৃথিবীর সেই পা-হাঁটা ক্যারাভাঁর পথের মতোই মানুষের মনের পথ, বিচারের রীতিও আজ আকাশের অন্য দিকে ধাবিত। চার বৎসর পূর্বে আরও নিচু দিয়ে যেতে যেতে প্লেনের যাত্রীদের নাকি অকসিজেনের মুখোশ পরতে হতো। দু চোখ ভরে পৃথিবীর চিরতপস্বিনী রূপ দেখে তাঁরা সম্ভ্রমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতেন। অনেকটাই তা আজ আমার অগোচর রইল। দিনের শ্রান্তিতে, জেট প্লেনের এই স্নায়বিক পরীক্ষায়, অনভ্যস্ত যন্ত্রনিনাদে আমি অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। চোখ বুজে আত্মসমর্পণ করলাম ক্লান্তির নিকটে—তন্দ্রা, তুমি আমাকে গ্রহণ করো।

কখন মনে হলো কী একটা অবস্থান্তর ঘটছে। সচকিত হয়ে চোখ খুললাম। বুঝলাম প্লেন নামছে। আস্তে আস্তে মাটি-জলের ছবি-আঁকা পৃথিবীর গালিচা দেখতে পাওয়া গেল নিচে। একটু সরসতাও ফিরে এলো প্রাণে। প্রায় সাড়ে তিনটের পরে প্লেন তাশখন্দ এয়ার পোর্টে ভূমিস্পর্শ করলে। আমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর কোলে আশ্রয় পেলাম আবার।

বিস্তীর্ণ বিমানক্ষেত্র তাশখন্দের এয়ারপোর্ট! বিমানের অভ্যন্তর থেকে বেরুতেই বিস্ময় চোখে জাগছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লাগল চোখে-মুখে শীতের হাওয়ার তুষারমাখা প্রথম শীতের সম্ভাষণ। ভারী কোটে দেহ জড়িয়েছিলাম, তবু একটু চমকিত হলাম। ভারতের বাইরে পদার্পণ করলাম, নামলাম সোভিয়েত ভূমিতে। বিমানক্ষেত্র ভেজা কাদায় পিছল, আমার ভারী জুতো-পরা পা সচ্ছন্দে পদক্ষেপ করবে, এমন সাধ্য নেই। সকালে বিষ্টি ছিল, তা দিল্লীতেই শুনেছি। প্রতীক্ষাগৃহ পর্যন্ত যাবার পথের দুপাশে বরফ জমে আছে। গলছে, না গলেছে, বুঝতে পারা গেল না।

এই সোভিয়েত দেশ: অনেকের কাছে স্বপ্নের দেশ, অনেকের কাছে পাপের রাজ্য। আমার কাছে কী? পিছল পথের উপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে যেতে যেতে মনে হলো পৃথিবীর মাটিতেই তো হাঁটছি, পৃথিবীর আকাশের তলাতেই চলেছি। সব শুদ্ধ হয়তো পৃথিবীর মানুষকেই দেখব। তাকেই দেখেছি আমার স্বদেশে, দেখব এই বিদেশেও। স্বপ্নের দেশই হোক, পাপের রাজ্যই হোক, মানুষের দেশই তো হবে।

সহযাত্রী সেই মঙ্গোলীয় যুবাটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এয়ারপোর্টের প্রতীক্ষাগৃহেই একদিকে কাস্টম্‌স্। সেখানে নিয়ে গেলেন, কাগজপত্র পরীক্ষা হবে। তাশখন্দ আমাদের পক্ষে সোভিয়েতের প্রবেশদ্বার। সহযাত্রীই রুশ ভাষায় আমার বক্তব্য অনুবাদ করে দিলেন। এখানকার ভাষা অবশ্য উজবেগী তুর্ক ভাষা—যে ভাষা ছিল বাবরের। এখানকার ফির্‌ঘানা অঞ্চল থেকেই তিনি কাবুল জয় করে দিল্লীতে গিয়ে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মোগলদের পিতৃভূমি তা হলে এই দেশ, মাতৃভাষাও এই তুর্ক ভাষা, আর শুনেছি মূল 'বাবুরনামা' লেখা হয়েছিল তুর্ক ভাষায়। এখনো তুর্ক-সাহিত্যের তা পরম গৌরব, যেমন উজবেগদের গর্ব 'বাবুর'। এই তুর্ক সাহিত্যের চর্চায় এরা সোভিয়েত আমলে মহোৎসাহী হয়। ইংরেজী অনুবাদে আমি তাদের কবিতাও পড়েছি। দু একটি অনুবাদও করেছিলাম। তবে এখন অন্তত এ গৃহে যাদের তুর্ক বলে মনে হলো, তারা চেহারায় কাশ্মীরী বা পাখ্‌তুনীদের আত্মীয়-কুটুম্ব এবং পাশ্চাত্ত্য জাতিদের থেকে পৃথক। কিন্তু বেশভূষায় অনেকেই পাশ্চাত্ত্যানুবর্তী—আর প্রায় সকলেই রুশ ভাষাও বলতে অভ্যস্ত।

প্রতীক্ষাগৃহে এবার আমাদের রাষ্ট্রদূত মহাশয়কে দেখতে পেলাম। মঙ্গোল সহযাত্রী তাঁকে দিল্লীতেও জানতেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করবার জন্য এগিয়ে গেলাম। মস্কো গিয়ে আর সাক্ষাৎ করবার সময় হবে কিনা কে জানে। আমি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে চলেছি। এই কর্মের নিমন্ত্রণ এসেছে আমাদেরই বৈদেশিক বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে। রাষ্ট্রদূতই ভারতের বাইরে ভারতবাসীর মুখপাত্র, তাদের অভিভাবক। এর পরে যে-কোনো সমস্যায় আমার স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূতই হবেন আমার ভরসাস্থল। নিজেই তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। মনে ভয় ও সংকোচ না ছিল তা নয়। কিন্তু বিদেশে তাঁর সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে মনে হলো, এই বিশিষ্ট ভদ্র ব্যবহার ও সহৃদয়তা—এ হলো সেই ক্রমদুর্লভ বাঙালী সংস্কৃতির মর্মের জিনিস। সম্ভ্রম বোধ করতে হয়, ভারতবাসী হিসাবে আশ্বস্তও বোধ করলাম—বাঙালী হিসাবে।

প্রায় এক ঘণ্টা সেই প্রতীক্ষাগৃহে বসে যাত্রীদের দেখছিলাম। আলমা আতার যাত্রীরা এখান থেকেই অন্য প্লেনে যাবেন। আবার প্লেনে ডাক পড়ল। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে প্লেন আবার ছাড়ল। শীতের বেলা পেরিয়ে যাচ্ছে। এবার মস্কো। দিল্লী থেকে তাশখন্দ ২,২৪২ কিলোমিটার

(১৩৯৩ মাইল), কিন্তু তাশখন্দ থেকে মস্কো আরও দুর, ২৯৯৮ কিলোমিটার
(১৮৬৩ মাইল), চার ঘন্টা দশ মিনিটের পথ। আমার দেহ ও মন দুইই
আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—একটানা প্লেনের আওয়াজ আমার দুঃসহ মনে হয়।
বাইরেও অন্ধকার, সন্ধ্যা ও মেঘের যোগাযোগে কিছু দেখবার উপায় নেই।
এরই মধ্যে ক্লান্তিতে অবসাদে চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল। তা-ই ছিল ভালো।
কিন্তু এয়ারহোস্টেস্ এলেন খাবার পরিবেশন করতে। ঘুমের জড়িমা কাটিয়ে
ট্রেতে এবার যা দেখলাম তা সম্ভবত গোমাংস। মাংস খাই না বলাতে
আমাকে আর একটি প্লেটে তিনি শুধু অন্নও এনে দিলেন। আমাদের মতো
খাদ্যাখাদ্য-বিচারীরা তাঁদেরও পরীক্ষায় ফেলেন। কোথায় পাবেন আমাদের
উপযোগী খাদ্য? আমায় অবশ্য যা-ই দিলেন কিছুই তখন রুচল না। নেবু-চা,
রুটি দু-খণ্ড ও ফল মুখে দিয়ে তাঁদের বিপদ চুকিয়ে দিলাম। ঘুমুবার চেষ্টা
করাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তা সহজ নয়। প্রায় চোখ লেগে এসেছে—এমন
সময় আবার মনে হলো প্লেনের গতিভঙ্গ হয়েছে। অদৃশ্য সুদূরের দীপাবলীতে
দিগন্তে দেখলাম আলোকের উদ্ভাস। জেট প্লেন অন্তত আধঘণ্টা আগেই
গতিবেগ সংযত করতে করতে অবতরণে উদ্যোগী হয়। চোখের ঘুম পালিয়ে
গেল—মস্কো! সুদূর স্টেশনের সংকেত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। রাত্রির
আঁধারে অন্য কিছু দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্লেন আবার ভূমি স্পর্শ করে
গতিবেগ সম্বরণ করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে থামল। আঃ মুক্তি! অন্তত
সেই শব্দ, সেই শ্বাসরোধী অস্বস্তি তো শেষ হবে। আমার ঘড়িতে তখন সাড়ে
ন-টা, মস্কোর ঘড়িতে সাতটা। তাশখন্দে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেছি, ঠিক সাত
ঘণ্টা আকাশে কাটিয়ে দিল্লী থেকে আমি মস্কো এসে পৌছলাম সেইদিনই।

অনভ্যস্ত হাতে শীতের কোট প্রভৃতি এঁটে-সেঁটে প্লেন থেকে নামলাম।
প্রথমেই দেখা হলো প্লেনের সন্নিকটে আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের তৃতীয়
সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি এসেছিলেন রাজদূত
মহাশয়কে নিয়ে যেতে। কিন্তু পাটনাতে তাঁর স্ত্রী আমাদের সহকর্মিণী ছিলেন;
তিনি নিজে সেখানকার ভূতপূর্ব অধ্যাপক হিসাবে আমার পরিচিত। আমার
আগমনের তারিখ না জানলেও স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছেন আমিও শীঘ্রই
আসছি। কুশল প্রশ্নাদি হলো। আমার মঙ্গোলীয় সহযাত্রীও এবার বিদায়
নিলেন—মঙ্গোলীয় দূতাবাস থেকে তাঁকেও নিয়ে যাবার জন্য কর্মচারী
এসেছেন। অপর যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাই এগিয়ে চললাম স্টেশনের

বাড়ির দিকে। শীতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডায় আমার হাড় জমে যাচ্ছিল, তাতে আবার মাথা অনাবৃত, তা গরম স্কার্ফ দিয়ে জড়াতে আমার মন সরে নি। পথটুকু দীর্ঘ নয়, কিন্তু একা এই বিদেশে এই বাঙালিনার পক্ষে অন্তহীন। কে আমাকে নিতে এসেছেন বা মোটেই কেউ এসেছেন কিনা কিছুই জানা নেই। ঘরে প্রবেশ করে হাঁফ ছাড়লাম তবু। একা দাঁড়িয়ে আছি—ঠাণ্ডা কম। আমাদের রাজদূত মহাশয় আমার খোঁজ নিতে ভুললেন না। আশ্বাস দিয়ে জানালেন—কেউ না এসে থাকলে তাঁরাই আমার ব্যবস্থা করবেন। আমি এদেশের মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনের নিমন্ত্রিত অতিথি, তাঁকে জানালাম। নিশ্চয়ই সেই শিক্ষাবিভাগের পক্ষ থেকে কেউ আসবেন, আমি প্রায় নিশ্চিত। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারি কি?

ইতিমধ্যে কাঁচের শার্সির বাইরে দুটি পরিচিত হাসিমুখ দেখা গেল। একটি বাঙালী মুখ; আরেকটি মুখশ্রীতে বাঙালী, কিন্তু রঙে বেশভূষায় অবাঙালিনী। শ্রীযুক্ত ননী ভৌমিক আমার বহুপরিচিত। কিন্তু শ্রীমতী এইফ্গেনিয়া বীকভা তা নন, তিনি আমাদের পরিবারের পরিচিতা। ফটোতে তিনি আমাকে দেখেছেন, আমিও তাঁকে দেখেছি—এর বেশি চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের হয় নি। তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন বাঙলার গবেষণায়, আমি তখন পাটনাতে ছিলাম! আমি যখন সেবার কলকাতা এসেছি, তিনি তখন গিয়েছিলেন পুরী ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। আমাদের গৃহেও তিনি এসেছিলেন পরে। চোখের দেখা আমাদের হয় নি—কিন্তু পত্রে আলাপ চলেছে, তাঁর সঙ্গে শুধু নয়, তাঁর কিশোরী কন্যাদের সঙ্গেও। আর এইফ্গেনিয়াকে আমি সেই সূত্রে নাম পর্যন্ত দিয়েছিলাম 'মঞ্জুলা'। আমার স্বামীর পরিচয়ে আমিও তাঁর 'অরুণা বউদি'। এতক্ষণে আমি আশ্বস্ত হলাম। তাঁরাও ভেতরে এসে গেলেন। এইফ্গেনিয়া সাগ্রহে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন—রুশ দেশের শীতবস্ত্রের ভারে আলিঙ্গন করতে গিয়ে বোধহয় দু-জনার মধ্যে ফাঁক থেকে গেল এক হাত। হাতই স্পর্শ করতে পারল হাতকে। এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর কানে গেল। 'অরুণা বউদি' পত্রের এই সম্বোধনটা স্নেহ কোমল একটা নতুন সত্তা লাভ করল। ওর মুখে বাঙলা কথা আড়ষ্ট নয়, আর বেশ আত্মীয়তা-মাখানো।

আট ঘণ্টা পরে মনটা প্রথম নিশ্চিন্ত হয়েছে। অচিরেই সোভিয়েত দেশীয় শিক্ষা-মন্ত্রী দপ্তরের দু-জন ভদ্রলোকও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা একজন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী গ্যাসেন্কফ্, অপরজন শিক্ষাবিভাগীয়

রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত তীম্‌রিয়েফ। অভিবাদনাদির শেষে তাঁরাই আমাকে কাগজপত্র পূরণ করতে সাহায্য করলেন, আমার 'ব্যাগাজ' (মালপত্র) খালাস করবার জন্য এগিয়ে গেলেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা সামান্য নয়। ব্যবহার্য জিনিস ব্যতীতও ছিল প্রয়োজনীয় বইপত্র—লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগকর্তারা মালের ব্যয় বহন করছেন। দেখা গেল সবই ঠিক এসেছে। এবার আমাদের রাজদূত মহাশয়কে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে এলাম। আমার জিনিসপত্র সরকারী শিক্ষা বিভাগের স্থির করা গাড়িতে ওঠানো হয়ে গিয়েছে। আমিও বন্ধুদের সঙ্গে উঠে বসলাম। রাত্রির অন্ধকারেও দেখলাম দুপাশে গাছের গুঁড়ি বরফে সাদা হয়ে আছে—এই রুশদেশের প্রিয় গাছ বার্চ। রাস্তার দুধারেও বরফের স্তূপ—বোধহয় কলে ঝেঁটিয়ে জড়ো করা। আশ্চর্য হয়ে মস্কো মহানগরীর এই নূতন বিচিত্র পথ দেখতে দেখতে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করছি। কী জিনিস দেখলাম ও কী জিনিস দেখলাম না, তা বলতে পারি না। বুঝলাম শহরের ভেতরে এসেছি, বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে নামলাম এক বড় হোটেলে। এই উক্রেইনা হোটেল। বহিঃপ্রাঙ্গণ থেকে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে শীত-বাত্যারোধী ডবল-দুয়ার অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম তার বহিঃকক্ষে বা ভেষ্টিবুল-এ। মনে পড়ল গত ১৯৫৮ সালে যখন শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার স্বামী এদেশে আন্তর্জাতিক স্লাববিদ্‌ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁরা দু-জনাই এই হোটেলে উঠেছিলেন—পরেও তাঁরা এখানে আবার ছিলেন ১৯৬০এ। সেই ১৯৫৮-এর কথা 'পরিচয়'-এর একটি রসনিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, উক্রেইনা হোটেলের বহিঃকক্ষসম্বন্ধে—বিরাট পৃথিবীর বিচিত্র মানুষের যাওয়া-আসায় তা যেন এখন পৃথিবীর 'মহামানবের সাগরতীর।'

হোটেলের খাতায় নামধাম যা লেখবার তা রুশ রাজপুরুষরা শেষ করলেন। বন্ধুরা আমাকে আমার কক্ষে নিয়ে গেলেন। সাতশো সাতচল্লিশ নং কক্ষ, অর্থাৎ সাত তালার সাতচল্লিশ নং কক্ষ। 'ডিনার' পথেই সমাপ্ত হয়েছে—যা-ই আমি খাই না কেন। খাদ্য আর চাই না, আমার সর্বাধিক প্রয়োজন তখন বিশ্রাম। কক্ষের প্রতিটি কোণ থেকে যেন সেই আহ্বানই শুনছিলাম। বন্ধুরা সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিলেন। শয্যায় নিজেকে সমর্পণ করলাম। কিন্তু ঘুম আসে না। শীতের দীর্ঘরাত্রি এই নিদ্রাহীন চক্ষে দীর্ঘতর হয়ে উঠল। জানালার ডবল কাঁচ

বন্ধ, পর্দায় তা অবগুণ্ঠিত। তার মধ্য দিয়েও মস্কো মহানগরী আমার চোখে পড়তে লাগল। আমি তার অতিথি। মাত্র কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে দেশকালের কোন্‌ সীমানা পার হয়ে এলাম! সেই সনাতন ভারতবর্ষ থেকে একেবারে এই একালের মস্কোতে। আর এ কি শুধু দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা! কত বিচিত্র এই মানুষের জীবন—নিজের দিকে চেয়েও যে তার বিস্ময়কে বুঝে উঠতে পারি না। আমি—যে আচারে নিয়মে প্রকৃতিতে বাঙলা দেশের 'কুনো' মেয়ে, ভারতবর্ষের পথে পর্যন্ত বেরিয়ে যে স্বস্তি পায় না—জীবনের এ কি বিচিত্র গতি, তাকেই এনে পৌঁছে দিয়েছে পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি পার করে, এই কোলাহলমুখর প্রচণ্ড যুগের কর্মচঞ্চল কেন্দ্রস্থলী মস্কোতে—সর্বজাতির পদধ্বনির পদাবলীতে মুখরিত মস্কোর এই বত্রিশ তালা উক্রেইনা হোটলে—নমস্কার, নমস্কার এই জীবনকে—পৃথিবীর সঙ্গে সে আমার পরিচয় সার্থক করে তুলছে। কিন্তু আরও কতবার নমস্কার করব মানুষের মনকে? মানুষের মন যে বিচিত্রতর সে কথা তো কত পড়েছি, শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু বিচিত্রতম এই সত্য—জীবন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ-বিভেদ রাখতে দেয় না। মস্কো চিনি না—কিন্তু কই, অপরিচিত নয় তো তার মানুষরা। আমার হয়তো মস্কোর শীতের উপযোগী পর্যাপ্ত পরিধান নেই, এই আশঙ্কায় বীকভা আমার জন্য এয়ারস্টেশনে বহন করে এনেছে এক গরম কোট। তার স্নেহ, ভালোবাসা ও সহৃদয়তার তো আর কথা দিয়ে পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। এই তো মস্কোর মেয়ে—যারা নাকি স্বচ্ছন্দগতি, আর আমি বাঙালী মেয়ে—যাদের পা নাকি সঙ্কোচে-দ্বিধায় সদা জড়িত। দুইই তো সত্য। দেশ-কাল-পাত্রের এই ব্যবধানেও তবু তো মানুষের মনের বুদ্ধিতে, মানুষের অন্তরের অনুভূতিতে আমাদের সমধর্মিতাই স্পষ্ট।

কিন্তু মানুষের মন সত্যই বিচিত্র। মস্কো, এই উক্রেইনা হোটেল, সব ছাড়িয়ে আমার মন চলে গেল আমার স্বদেশে—গৃহে—পরিবারে। এই নিঃসীম বিচিত্র রাত্রি জুড়ে—নীরন্ধ্র দেশকালের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করে, আমার চোখে স্থির হয়ে থাকল আমার মায়ের ব্যথিত করুণ চোখ। মনে জেগে রইল—বিদায় বেলায় আমার স্বামীর প্রসন্ন বিষণ্ণ হাসি—এতক্ষণে পৃথিবী বান্ময় হয়ে উঠল আমার প্রাণে।

বা তা য় ন

সেই ভদ্রমহিলার নাম পার্ল বাক

পার্ল বাক নাম্নী সেই শ্রুতকীর্তি মহিলাটি ভারতে এসেছেন সম্প্রতি। উদ্দেশ্য, তিব্বতী পলাতকদের নিয়ে নতুন একখানা উপন্যাস লিখবেন। লিখিয়ে তিনি, না-লিখে নাকি আর থাকতে পারছেন না। তাই উত্তর-সপ্ততির এই প্রবীণতাকে উপেক্ষা করে সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষে, যেখানে রাজা, যোগী আর বিষধর সর্পের সঙ্গেই এসে পরম আশ্রয় লাভ করেছেন তিব্বত থেকে পলাতক লামা দলাই; অশ্বতরের ক্যারাভান বোঝাই করে তাল তাল সোনা, মাণিক্য, হীরে-জহরত নিয়ে আসতে অবশ্য যাঁর কোনোই বেগ পেতে হয় নি। শ্রীমতী পার্ল বাক হঠাৎ এমন তিব্বত-দরদী হয়ে উঠলেন কেন এবং কবে থেকে তাঁর এই অনুরাগের প্রসার, এ প্রশ্ন আপনাদের মনে হতে পারে। এর উত্তর খুঁজতে হলে যেতে হবে এই মহিলার খ্যাতির উৎস সন্ধানে। তিনি দীর্ঘকাল চীনে বাস করেছেন। চীনাজীবন নিয়ে বড়ো বড়ো বই লিখে দুনিয়া-জোড়া অনেক হাততালি আর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। 'গুড-আর্থ' উপন্যাসের জন্য নোবেল একাডেমীর শিরোপাও জুটেছে এই ভদ্রমহিলার। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে এই মহিলার বইগুলি পড়লেই দেখা যাবে তাঁর লেখার চীন আর আসল চীনের চেহারায় আসমান-জমিন ফারাক। 'ড্রাগনের বীজ' লিখেছেন তিনি এবং এই বীজ কমিউনিজম-বিরোধিতার। তাই চীনের নবজন্ম হবার পর এই চীনগতপ্রাণা মহিলা আর চীনে থাকতে পারলেন না। চলে এলেন তাঁর আসল জায়গায় আমেরিকায়। প্রায় চল্লিশ বছর চীনের জলমাটিতে বাস করে, চীনা জনগণের আতিথেয়তার পুরোপুরি সুযোগ নিয়ে এখন তিনি আবিষ্কার করেছেন যে চীনারা নাকি খুবই জাত্যাভিমানী, প্রাক্তন ওয়ার-লর্ডদেরই উত্তরাধিকারী চীনের বর্তমান লোকায়ত্ত সরকারের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে আধুনিক মননের পরিচয় নেই। তার ফলেই দলাই-এর ধর্মান্ধ পুরোহিততন্ত্রকে লামার পোতালা প্রাসাদ ছেড়ে ভারতের নৈনিতালে এসে লোটা-কমণ্ডলু নিয়ে ভগবান

তথাগতের উপাসনায় দিন কাটাতে হচ্ছে। পার্ল বাকের কণ্ঠস্বরকে কেউ যদি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং এফ. বি. আই-এর হ্যাণ্ড-আউট বলে মনে করেন তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এবং তিনি পলাতক তিব্বতীদের নিয়ে যে নতুন উপন্যাস লিখবেন তার জন্য এতদূর কষ্ট করে না এসে আমেরিকায় তাঁর বাড়িতে বসেই লিখতে পারতেন। কারণ, এই উপন্যাসের আসল প্রেরণার উৎস ওয়াশিংটনের সেই বহুখ্যাত ভবন, যার নাম 'হোয়াইট হাউস'। চীনের প্রতি তাঁর দরদের আরেকটি নমুনা তিনি দেখিয়েছেন মার্কিন সরকারের কাছে চীনে খাদ্য বিক্রি করার আবেদন জানিয়ে। চীন নাকি আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে চেয়েছে—নগদ মূল্যে উদ্বৃত্ত খাদ্য। এমন কি স্বাভাবিক মার্কিন ধর্ম অনুযায়ীও এই খাদ্য দেওয়া হবে না। কারণ, চীন কমিউনিস্ট। পার্ল বাক বলেছেন, এই খাদ্য চীনকে দেওয়া হোক দুটি শর্তে। এক, চীন এই খাদ্য অন্য কোনো দেশকে দিতে পারবে না। দুই, চীনের মানুষকে জানাতে হবে এই খাদ্য এসেছে আমেরিকা থেকে। চীনের মানুষ নিশ্চয়ই পার্ল বাকের ওকালতির ওপর ভরসা করে বসে নেই। যেমন থাকে নি কিউবার জনগণ। তবুও, ভারতে আসার আগে এই বিবৃতিটা খুবই জুৎসই হয়েছে, প্রোপাগাণ্ডার দিক থেকে।

হেমিংওয়ের চারটি সম্ভাব্য উপন্যাস

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রাণোচ্ছল চরিত্রের অবসান হলো। হেমিংওয়ের বিরোধীরাও হয়তো এই উক্তির সঙ্গে একমত হবেন। হেমিংওয়ে বিপ্লবী ছিলেন না। কিন্তু বৃহৎ, উদ্দাম ও বিশালতায় উদ্দীপ্ত জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। রচনার উপকরণে, তার ব্যঞ্জনায়, বিন্যাসে হেমিংওয়ের কাহিনীর প্রবলতম আকর্ষণ ছিল সম্ভবত এইটিই। হেমিংওয়ে, অনেকের সন্দেহ, স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। ১৯৬১-র ২রা জুলাই ইডাহোতে নিজের বাড়িতে নিজেরই বন্দুকের উৎক্ষিপ্ত গুলিতে সাহিত্যক্ষেত্রে মাটাডোর, বহুবার মৃত্যু-ফেরত হেমিংওয়েকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি হেমিংওয়ের পত্নী তাঁর লিখন-টেবলের কাগজপত্র ঘেঁটে চারটি সম্ভাব্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপি সেই বিখ্যাত সিম্বলিক গল্প 'ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী'-র সহযাত্রী হবার যোগ্য। অপরটির পশ্চাৎপট ইওরোপের সেই মোহময়ী

নগরী পারী। ইওরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেখাচিত্র তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে এবং চতুর্থটি আফ্রিকার জাগরণকে কেন্দ্র করে লেখা। আফ্রিকার প্রতি হেমিংওয়ের রোম্যান্টিক আকর্ষণ ছিল। যখন তখন তিনি ছুটে যেতেন সেই কালো মানুষের দেশে, যাদের হৃদয় হীরকের মতো উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। হেমিংওয়ের এই সম্ভাব্য উপন্যাসগুলির জন্য পৃথিবীর মানুষের উৎসুক আগ্রহ থাকবে। অন্তত, আফ্রিকাকে তিনি কী চোখে দেখেছেন, আমাদের কৌতূহল তার জন্য।

গ্রীক বীর মানোলিস গ্লেজোস

গ্রীসের মানুষের কাছে একটি প্রিয় নাম, উজ্জ্বল বীরত্বের প্রতীক মানোলিস গ্লেজোস। অকুতোভয় সাংবাদিক, পার্টিজান নেতা, গেরিলাযুদ্ধের নায়ক মানোলিস। ‘আভগি’ নামে এথেন্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। মানোলিসই সেই অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমিক বীর সাংবাদিক, নাৎসীকবলিত গ্রীসের ভয়ঙ্কর দুর্দিনে ১৯৪১ সালে এথেন্সের ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ্যাক্রোপোলিস ভবনের চূড়ায় ওড়ানো নাৎসী স্বস্তিকা পতাকা যিনি নামিয়ে মুক্ত গ্রীসের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িয়েছিলেন। হিটলারের দল ইতিহাসের ঋণ শোধ করে চলে গেছে। কিন্তু গ্রীসে তাদেরই অনুচররা বীর মানোলিসকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তারা মানোলিসের কলমকে ভয় পায়। আজ দীর্ঘ সাড়ে চার বছর মানোলিস গ্লেজোস গ্রীসের কারমানালিস সরকারের হাতে বন্দী। এথেন্স থেকে দূরে গ্রীসের সমুদ্রে একটি দ্বীপে এই প্রবল শক্তিমান দেশপ্রেমিক সাংবাদিক ও লেখককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বন্দী অবস্থাতেই মানোলিস গ্লেজোস আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার পুরস্কারে সম্মানিত ও নন্দিত হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানোলিসের মুক্তি লাভ ঘটেনি। গ্রীস সরকার তাঁকে কয়েকবার প্রাণদণ্ড দেবার ষড়যন্ত্র করে বিশ্বজনমতের ভয়ে পিছিয়ে গেছেন। কিন্তু কারান্তরালে অসুস্থ এই বিপ্লবী যোদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী মানুষ কী করবে সেটাই আজ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। মানোলিসের মুক্তির দাবি, শান্তিকামী মানুষের একান্ত কাম্য। গ্রীসের গৌরব মানোলিস দীর্ঘজীবী হোন।

পুশকিনের ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

আলেকজাণ্ডার পুশকিন এক আশ্চর্য কবি। পুশকিনের মৃত্যুর পর একজন রুশ সমালোচক বলেছিলেন: “পুশকিন আমাদের সব।” আমরা একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই এভাবে চিন্তা করতে শিখেছি। রাশিয়ার মানুষের কাছে পুশকিন, বাংলার রবীন্দ্রনাথের মতো। শেক্স্পীয়র, মাইকেল এঞ্জেলো কিংবা বীঠোভেনকে পশ্চিম ইওরোপ যে আসন দিয়েছে, সে আসনে পুশকিনও তাঁদের সঙ্গে বসবার যোগ্য। পুশকিন রাশিয়ার আত্মার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার সার্গেইভিচ পুশকিনের জন্ম ৬ই জুন, ১৭৯৯ সালে। মস্কো শহরে। পিতার দিক থেকে তিনি এক অভিজাত অথচ উড়ন-চণ্ডী বংশের উত্তরাধিকারী। তাঁর সমসাময়িকরা পুশকিনকে বলতেন ‘রাশিয়ার বায়রন’। রুশভাষায় শ্রেষ্ঠতম রচনার গৌরব এই কবির। কবিতায়, নাটকে, গল্পে সর্বত্রই এক পরমাশ্চর্য দীপ্তি ছড়ালেন তিনি। জীবনে বায়রনের মতোই তিনি ছিলেন উদ্দাম, উচ্ছল। মৃত্যুও তাঁর এক আশ্চর্য কাহিনী। ১৮৩৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ডি আন্থিস নামে একজন ব্যারনের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। দুদিন পর সে আঘাতেই পুশকিনের মৃত্যু হয়। এ-বছর রাশিয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুশকিনের ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। পুশকিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর কবিতার পংক্তিই বারবার মনে হয়েছে:

“My spring is past, my summer over,
And dead the fires of other days.
Oh, Eros, God of youth! Your servant
Was loyal—that you will avow.
Could I be born again this moment,
Ah, with what zest I'd serve you now!”

পুশকিনের বিখ্যাত কাব্যোপন্যাস ‘ইউজিন ওনিগিণে’র সমাপ্তিতে তিনি বলেছিলেন:

“Blessed is he who leaves the glory
Of life's gay feast ere time is up.”

পুশকিন জীবনের উচ্ছলিত পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করেই গিয়েছেন।

-নতুন ইওরোপীয় ভাষা

এসপেরেন্টো নয়, নতুন আরেকটি ভাষার জন্য আবেদন জানিয়েছেন বৃটেনের একজন লেবর এম. পি. আর্থার উডবারণ। ইওরোপীয় খোলা বাজারের ফলে যে বাজারী হট্টগোল শুরু হয়েছে তাতে একটি সামঞ্জস্য আনবার জন্য এমন একটি ভাষা দরকার হয়ে পড়েছে যা ইওরোপের সবাই মোটামুটি বুঝতে পারবে। এর জন্য তিনি প্রস্তাব করেছেন একটি ইওরোপীয় ভাষার একাডেমী স্থাপনের। নতুন শব্দ প্রত্যেক ভাষা থেকে বিশুদ্ধ বানানে ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে গ্রহণ করা হবে। গ্লাসগোতে একটি নতুন 'ভাষা ল্যাবোরেটরি'ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বার্মিংহামের একটি মোটর কারখানা ইওরোপীয় ভাষার ব্যুৎপত্তির জন্য শ্রমিকদের পুরস্কার দেবার কথাও ঘোষণা করেছে। এতে শ্রমিকরা প্রচুর সাড়া দিয়েছেন। ইওরোপেও আজ শুধু ইংরেজির রাজত্ব নেই। এদেশে ইংরেজির জন্য যাঁরা আক্ষেপ করছেন তাঁরা এ খবরটি থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে কোনো একটি ভাষাই আজ আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। ইওরোপের এই নতুন ভাষার মূল ভিত্তি হবে রোমান্ (লাটিন ভাষাগোষ্ঠী) ও জর্মন ভাষার মিশ্রণ।

অরুণ দেব

রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের 'অর্ধনারীশ্বর রূপ'—এ-কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীরা প্রায় সকলেই একমত। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে এ-কথাও অনেকটা প্রমাণিত যে তাঁর গানে বৈচিত্র্য অসামান্য—কি সুরের কি ভাবের দিক থেকে। কিন্তু কোনো বৈচিত্র্যেরই সবিশেষ তাৎপর্য থাকে না যদি না তা কোনো নিগূঢ় ঐক্যে অন্বিত হয়। একটু কান পাতলেই বোধহয় শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গানে আছে নতুন একটা মেজাজ, নতুন এক সমন্বয়, যাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেটা কী, তাকে কথায় বা গানের পারিভাষিকে সংজ্ঞা দেওয়া যায় কিনা, বিশেষজ্ঞদের কাছে সেটাই আমার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সূত্রেই আমার দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

সঙ্গীত রচনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতের কাছে ছিল ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের, বিশেষত ধ্রুপদের, সুবিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত আদর্শ। ঠাকুর-পরিবারের সাঙ্গীতিক পরিবেশে এই আদর্শ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু দেশের অন্যত্রও দেশী রাগরাগিণীর যোগসূত্র কোনোকালে ছিন্ন হয় নি। কবিতার ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম। কারণ বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছে প্রধানত ইংরেজি ভাষার দৌত্যে। ভাষার মারফৎ আমরা পেলুম ইংরেজি কাব্যসাহিত্য। তার ফল আর যাই হোক, আত্মপ্রকাশের দেশজ সাহিত্যিক রীতি বা ক্ল্যাসিক মেজাজের সঙ্গে যে ইংরেজি শিক্ষিতদের বিচ্ছেদ ঘটল, এটা খুব স্পষ্ট। অথচ তাঁরাই হলেন দেশের নেতৃস্থানীয়। এদিকে বিদেশী মেজাজ বা আঙ্গিককে এ-দেশীয় পরিবেশে আয়ত্ত করা সহজ হয় নি। তাই রবীন্দ্রপ্রতিভার অসামান্য প্রাণময়তা সত্ত্বেও তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যপ্রয়াস অনেকখানি অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত। এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমালোচকদের দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আমার কাছে খুব আকস্মিক মনে হয় না। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাষার দৌত্য কার্যকর নয় বলেই এবং ইওরোপীয় সঙ্গীতের ইডিয়ম আমাদের কাছে একান্তই দুরধিগম্য বলে, পুরনো দেশী সঙ্গীতের রীতিপদ্ধতি

এদেশের ইঙ্গবঙ্গীয়দের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বজায় থাকতে পেরেছে। বিদেশী সঙ্গীতের যা কিছু চর্চা তা বিচ্ছিন্ন পরীক্ষার স্তরেই নিবদ্ধ, তার সাফল্য কোনোদিন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় নি, হয়তো দেবেও না।

গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ প্রধানত এদেশে ধ্রুপদী সঙ্গীতের উত্তরসাধকরূপে। সঙ্গীত-সাধনার উত্তর পর্বেও এর গুরুত্ব তাঁর কাছে অসামান্য। ধ্রুপদ গানে তিনি পেলেন "একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।" ধ্রুপদের সুবিপুল মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর অনুভব এত সহজ ছিল বলেই কেবল আঙ্গিকগত সুসঙ্গতির বোধই নয়, বিষয় ও কলাকৌশলের অভিন্নতা এবং বিষয়গত সুসঙ্গতির বিষয়েও তাঁর প্রতীতি এত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। সেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের প্রথম পদক্ষেপেই এমন আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা সঙ্গীত ছাড়া অন্যত্র আর বোধহয় দেখা যায় না এবং ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণেই এটি সম্ভব হয়েছিল। তাই আঙ্গিকের সঙ্গতি ও ঐক্যকে তিনি সহজেই মেলাতে পারলেন তাঁর গেয় বিষয়বস্তুতে, তাঁর তৎকালীন বিশ্বভাবনায়। অনুভব করলেন যে "আমাদের সঙ্গীত একের গান, একলার গান—কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।"

গানেই যে তাঁর বিশ্বপরিচয় একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। তাঁর গানের কথাতেই পাই, বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন বিমোহিত, গানে গানেই তাদের বন্ধনমুক্তি। বিশ্বকবির চিত্তমাঝে যেখানে ভুবনবীণা নিত্য বেজে চলেছে সেখানে আমাদের জীবন সুরের ধারায় লুটিয়ে পড়ুক। গানের ভিতর দিয়ে যখন কবি ভুবনকে দেখেন তখনই তাকে চেনেন, জানেন। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে পথ চলতে চলতে কবি যে তুলনাহীনাকে দেখেছেন সেই চিরচেনাকে তিনি চিনতে পারেন গানে, ভরসা রাখেন যে চকিতে ক্ষণে ক্ষণে তাকে ফিরে পাবেন ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী তাঁর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে 'গানের গান'গুলির উল্লেখ করেছেন (দ্রুত উল্লেখের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানসম্বন্ধীয় গানগুলিকে ঐ নামই দিতেন) তাতে দেখি, "যিনি গান শুনছেন, গান শোনাবার তাগিদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন কবিকে, তিনি স্বয়ং সুরস্রষ্টা। সমস্ত রূপলোকই তাঁর সঙ্গীত, তিনি বেঁধে দিয়েছেন ধ্রুবপদ, সেই বিশ্বতানে জীবনকে মেলাতে হবে।" তখন "পৃথিবীর কবির কণ্ঠে জাগলো উত্তর।" গীতময় এই প্রত্যুত্তরে

"মর্ত্য কবির বিশিষ্ট্য অধিকার।" তখন বিশ্বহৃদয়-পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলে সুরে সুরে সুর মেলাতেই তাঁর বেলা যায় সাঁঝবেলায়। এই বিশ্ব-জোড়া গীতময় ঐক্যোপলব্ধির পেছনে হয়তো ব্রাহ্মসাধনা, মহর্ষিদেব ও উপনিষদের প্রভাব ক্রিয়াশীল, তবু ধ্রুপদী গানের মর্মগত সংহতির আদর্শও যে তাঁকে ঐদিকেই টেনেছে, একথা অনুমান করা খুবই সঙ্গত। আর প্রথম যুগের ধ্রুপদভাঙা ও ধ্রুপদাঙ্গ গানেই যে তাঁর তৎকালীন উপলব্ধির সার্থকতা, অসামান্যতা—একথাও সম্ভবত স্বীকার্য। তাছাড়া 'গানের গানে' সঙ্গীতের রূপক যেভাবে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে তাতেও দেখি ঐ একই কথার প্রমাণ। বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানে ক্ল্যাসিক্যাল আঙ্গিকের যে সঙ্গতি লক্ষণীয় তা ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তার ঐক্য ও সংহতির সঙ্গেই নিবিড়রূপে একাত্ম।

বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন যে "গঠন বৈচিত্র্যের বিবেচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর বা যুগ প্রবহমান।"[১] প্রথম যুগ ১৯০০ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় ১৯২০ পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট তৃতীয়। এই যুগবিভাগকে খুব কড়াকড়ি ভাবে বিচার করা অনুচিত, তবু টেকনিকের বিবর্তন বুঝতে এটা খুবই উপযোগী। এক একটি যুগ বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। যথা—

প্রথম যুগে [ক] বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতশিল্পীদের সংস্পর্শে বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য সুর অবলম্বনে সৃষ্ট গান ; এবং
[খ] সুর-বিন্যাসের আদর্শের প্রাধান্য।

দ্বিতীয় যুগে [ক] হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাঠামোটি বজায় রেখে বাহুল্যের বর্জন ;
[খ] কাব্য-প্রভাবিত সুরে নিজস্ব রচনা ;
[গ] লোকসঙ্গীতের সুরের ব্যাপক ব্যবহার ; এবং
[ঘ] নতুন তালের সৃষ্টি।

তৃতীয় যুগে [ক] অন্যান্য সঙ্গীতপদ্ধতির প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত সহজ সুরে সিধে তালে প্রকৃত বৈশিষ্ট্যময় রবীন্দ্রসঙ্গীত ;
[খ] কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ; এবং
[গ] সঙ্গীত ও নৃত্যের সমন্বয়।

১। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতার 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা' দ্রষ্টব্য।

হয়:তো দেখা যাবে যে এক এক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই পরবর্তী যুগের সম্ভাবনার বীজ নিহিত এবং বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এক যুগ অপর যুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তবু, আঙ্গিকের বিকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভাবনাও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একথার সম্যক ব্যাখ্যা এই যুগবিভাগে অনুপস্থিত। প্রথম যুগের আঙ্গিকগত সঙ্গতিই তাঁর ঐক্যময় বিশ্ববোধের প্রধান উৎস এবং সেই বোধের জীবননিষ্ঠ সততাই তাঁর সাঙ্গীতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে নতুন গান ও মেজাজ রচনায় সক্রিয়। টেকনিকের স্বাভাবিক বিকাশেই জীবনের উপলব্ধি, আবার সেই উপলব্ধি থেকেই টেকনিকের নব নব রূপান্তর ও সমন্বয়—এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি অন্যান্য মহৎ শিল্পীদের মতো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট। এখানেও দেখি "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা"র অনুরূপ প্রক্রিয়া এবং যদিও রবীন্দ্রনাথের মানসসরোবরে আকাশের ছবিই প্রতিফলিত তবু তার উৎস ব্যাপ্ত জীবনেরই সাধারণ্যে।

এই ব্যাপ্ত সাধারণ জীবনের পরিচয় ঘটল কবিজীবনের শিলাইদহ পর্বে। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গল্পে-গানে নব জন্মলাভ। শিলাইদহের প্রভাব যে তাঁর জীবনে কত সুদূরপ্রসারী তা রবীন্দ্রজীবনীর আলোচনা মাত্রেই সুস্পষ্ট। এই প্রভাবকে অস্বীকার করলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বিতীয় যুগে উত্তরণের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এ কেবল আঙ্গিক-ঘটিত পরিবর্তন নয়, সমগ্র জীবন ও জীবনদর্শনের মোড় ফেরা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে শিলাইদহের প্রভাবের দুটি বিরোধী ধারা বর্তমান। একদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় উদার ব্যাপ্তি যা কলকাতার শহুরে পরিবেশে খণ্ডিত ও বিকৃত, অন্যদিকে গ্রাম্য প্রাকৃত জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও বঞ্চনা। 'ছিন্নপত্রাবলী'র পর পর দুটি চিঠিতে (১৫২ ও ১৫৩ নম্বর) দেখি, একদিকে "রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু অভাসমাত্র দিলেই......একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে" এবং "নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে" কবি তখন আবৃত্তি করেন "ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!" আর অন্যদিকে ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন গ্রামের মধ্যে বর্ষার "জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং

মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চারদিকে ভাসতে থাকে,......উলংগ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে" এবং তখন গ্রামগুলির ঐ "অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার" দেখে "এতো কষ্ট এতো অনারাম মানুষের কী করে সয়" ভেবে পান না কবি। এই অভিজ্ঞতার পর চৈতন্যের নতুন লোকে উত্তরণে আর বিলম্ব থাকে না। সঙ্গীতে নতুন সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় "এক কীর্তনের ধরণের ভৈরবী"—পূর্ব সাধনার সঙ্গে যার যোগ বিচ্ছিন্ন নয় তবু বিশ্বের সঙ্গে তাঁর একটা নতুন "স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।" ওদিকে শতাব্দীর শেষ সূর্য রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল। পারিবারিক বিচ্ছেদের বেদনার সঙ্গে বিশ্বের বেদনা যুক্ত হয়। বিশ্বসুরের স্রষ্টা যেখানে বিশ্বসাথে যোগে বিহার করছেন সেইখানেই নিজের সঙ্গে তাঁর যোগ আবিষ্কৃত হতে থাকে। এই বিশ্ব প্রথম যুগের গীতময় ঐক্যের বিশ্ব নয়, অনেকটাই প্রাকৃত বিশ্ব, যেখানে ছন্দ বারবার ভেঙে গিয়ে প্রাণে দ্বন্দ্ব জাগায়, অন্তরের তানে আর বাইরের তানে মিল হয় না, ভবনে ভুবনে আধাআধি হয়ে থাকে। বৈচিত্র্যের নতুন উপলব্ধিতে সুরে কথায় আসে নানান বিন্যাস, লোকায়ত জীবন ও সুরের প্রতি জাগে নতুন ঔৎসুক্য, বিশ্ববোধের নতুন ভাঙাগড়ার সঙ্গে আসে গানের ক্ল্যাসিক্যাল কাঠামোয় নতুন ভাঙন ও সমন্বয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল প্রাণময় উত্তেজনায় কবি মরা-গাঙে বানের প্রথম প্রবলোচ্ছ্বাসে "জয় মা" বলে তরী ভাসানোর প্রেরণা পান। আসে বাঙলার মাটি ও জল আর বাঙলার নতুন গান। "নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল, স্থল, আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন।" জীবন ও প্রকৃতির এই সংলগ্নতার বোধ থেকেই এই যুগে সুরু হয় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ঋতু সঙ্গীতগুলি। এবং যতই দিন যায় ততই বিভিন্ন ঋতুর গানে আনে প্রথাসিদ্ধ রাগরাগিণীর পরিবর্তে নতুন রাগ বা রাগের মিশ্রণ, সুরবিন্যাসের নতুন ব্যঞ্জনা। শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে এই যুগের "প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে" গানটিতে ভীমপলশ্রী ও মূলতানের মিশ্রণে এক উদাস গাম্ভীর্য মিশ্রিত আর্ত আকুতি পরিস্ফুট। "আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়" গানে সোহিনী ও হিন্দোলের মিশ্রণ ; "তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে"

গানটির কেদারা সুরের মধ্যে দ্বিতীয় পদে বাউল সুরের উদাস করুণ বিহ্বলতা ;
"এবেলা ডাক পড়েছে কোনখানে" গানটির বাউল সুরের হঠাৎ ইমনে
পরিবর্তন ; "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে" এই ইমন সুরের গানে মাঝের
চরণে কীর্তনের সুরে ছন্দে বিরহ ব্যথার স্বচ্ছন্দ লীলা, ইত্যাদি। সব কিছুতেই
নতুন চেতনার প্রতিফলন। এরপর 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য'-একটি একটি
পুরনো তার খুলে সেতারখানি নতুন বেঁধে তোলার পালা। অজানার জয়
ঘোষণায় দুয়ারটুকু পার হওয়ার সংশয় যায় ঘুচে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চাবি
ভেঙে কবিকে একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেবার আকুতিও জেগে ওঠে মনে।
নতুন তালের প্রবর্তনেও বোধহয় সেই জীবন ও তাল-লয় পরিবর্তনেরই
পদচিহ্ন। কারণ এটাকে নিছক নতুন কিছুর এক্সপেরিমেণ্ট ভাবা কষ্টকর,
জীবন ও শিল্পের অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই তার আবির্ভাব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় স্তরেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের পুরনো
ঐক্যোপলব্ধি ভেঙে নতুন বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক মেজাজের সূচনা। যার পূর্ণতর
পরিণতি সঙ্গীত জীবনের তৃতীয় পর্বে। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্বে উত্তরণের
কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা অবশ্য নেই। তবু মোটের উপর চিনতে অসুবিধা
হয় না। এ যুগে স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে নানা সংকট তীব্র হয়ে উঠছে। জাতির
মানস প্রায়শই লক্ষ্যভ্রষ্ট। একদিকে জাতীয় আন্দোলনে নানা বিভ্রান্তি, শাঠ্য
ও শোষণের সঙ্গে অশেষবিধ বোঝাপড়া, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থে
সাধারণের স্বার্থকে বলি দেওয়া, পারস্পরিক দলাদলি, হিংসাদ্বেষ, ভেদবুদ্ধি ও
অবিশ্বাস ; অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যিক লোলুপতার আত্মপ্রকাশে বিশ্বের
ভারসাম্যে অস্থায়িত্ব ; ঔপনিবেশিক বাজারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রেষারেষি ও
সংঘর্ষ। এই খণ্ডিত দীর্ণ অস্তিত্বের দারুণ যন্ত্রণায় কবিচিত্তের অসামান্য প্রশান্তিও
বারবার বিচলিত হয়ে উঠেছে, এক পরম মানবিক বেদনায় তাঁর মন হয়েছে
উন্মথিত। পরম আগ্রহে প্রকৃতির অন্তর্লীন ঐক্যকে ধরতে গিয়েও বারবার
ব্যাহত হচ্ছিলেন তিনি—শিল্পগত ক্ল্যাসিক সংহতির বোধ বারবার খানখান
হয়ে যাচ্ছিল। তাই অন্যত্র যে বেদনাকে প্রকাশ করা যায় না তাকেই তিনি
রূপ দিতে চাইলেন তাঁর অজস্র অনুপম গানে। এই আশ্চর্য মানবিক বেদনাই
এ যুগের গানের বিশিষ্ট মেজাজ এবং গানের কথায় ও আঙ্গিকে তারই সহজ
প্রকাশ। এখন আর ক্ল্যাসিক কাঠামোর সংহত গাম্ভীর্য নয়, সে গাম্ভীর্য রক্ষা
করা অসম্ভব, এখন কেবল প্রকৃতির মৌল ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরহী

বেদনা। এই বিরহ বেদনা একান্তই আধুনিক, তাই প্রায়শ দেখা যায় প্রাচীন
রাগরাগিণী তার পরিপূর্ণ প্রকাশের অনুপযোগী। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের
ক্রমপরিণতি "হিন্দুস্থানি সুর ভুলতে ভুলতে"। এখনও অবশ্য ঐ আদর্শ টুকরো
টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল অনেক গানেই, যেহেতু তার প্রভাব সম্পূর্ণ
কাটানো যায় না—সে চেষ্টাও অবান্তর, তবু ঐ সুমহৎ বেদনা প্রকাশের
স্বাধীনতায় ওগুলি কেবল উপকরণ হয়েই রইল, পুরো কাঠামোটি রইল না,
যেহেতু "ওর আশ্রয় ছাড়তে না পারলে ঘর-জামাই-এর দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও
সত্বাধিকারে জোর পৌছয় না।" তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে "সকল আর্টেই
প্রকাশের উপকরণমাত্রই একদিকে উপায় আর অন্যদিকে বিঘ্ন। এই সব
বিঘ্নকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপোস
করতে করতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি, নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য লাভ করে।"
সুরের জাতিগত সাধারণতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশের
স্বাধীনতাই যখন লক্ষ্য তখন হিন্দুস্থানী রাগের ঠাটগুলিকে ভাঙতেই হলো।
শিল্পগত এই অনিবার্যতাতেই কবির নিঃসঙ্গ বেদনার স্বাধীন প্রকাশ।
আবার এই খণ্ডিত জীবনের বেদনাদীর্ণ চেতনাতেই ক্রমবিকাশের ধারায়
নতুন শিল্পগত সমন্বয়ের আবির্ভাব। এ সমন্বয় যেমন সহজ তেমনি করুণ—
সহজের জন্য কঠিন সাধনার চরম ফলশ্রুতি।

বলা বাহুল্য, এখনো রবীন্দ্রপ্রতিভার বহিরঙ্গে অনেক আনন্দ, অনেক
কৌতুকের হীরক দীপ্তি, অনেক হাসির ছটা। কিন্তু ভিতরে তার চোখের
জল—দুঃখের পারাবারে চোখের জলের জোয়ার। অশ্রুভরা বেদনা দিকে
দিকে জাগে। অন্য সব ঋতুর গান অপেক্ষা বর্ষার গানের সংখ্যাধিক্যও
বোধহয় এই কারণেই যে বর্ষা বিরহ, প্রত্যাশা ও ব্যাকুলতারই প্রতীক,
আর "তার ভিতরকার নিত্য নতুন অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা"ই মুক্তি পায়
মল্লার রাগাশ্রিত গানে। তাই ১৯২১ সাল থেকে যে 'বর্ষামঙ্গল'-গীতানুষ্ঠানের
সূচনা তার অনুবর্তন চলে বছরের পর বছর—১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। সেই
বর্ষার গানে ব্যথা যেন কূল মানে না, বাধা মানে না, হৃদয় ঘুম জানে না,
জাগা জানে না। বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদনা ভেসে আসে।
সোনার আলো শ্যামলে মিলায়, শ্বেত উত্তরী কালো হয়ে ওঠে। এমনকি
বসন্তের গানেও নতুন বেদনা, কবির হৃদয়দোলায় যে দুলছে সে কেবল সুখের
রাশিকেই দুলিয়ে দেয় না, "দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা।" এমন

আঁধারের চেতনাও কবির আগে কখনো আসে নি, সঙ্গে সঙ্গে আঁধার পার হওয়ার প্রার্থনা। [যথা: "তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি", "জলে নি আলো অন্ধকারে", "আর রেখো না আঁধারে আমায়", "নিবিড় অমা তিমির হতে", "সখি, আঁধারে একেলা ঘরে", "বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে", "সঘন গহন রাত্রি", "আলোকের পথে প্রভু", ইত্যাদি।

যখন সুখের গ্লানি অসহ হয়ে ওঠে, স্বপ্নের ভারে বোঝা ওঠে জমে, চিরজীবন শূন্য খোঁজা নিরর্থক মনে হয়, তখন রাতের পারের লুকানো আলোকেই দেখতে চান কবি। পরিণত বয়সের রূপদক্ষ কবি গানের এই বেদনার সঙ্গে মেশাতে চাইলেন নৃত্যের ছন্দ, কেবল স্বতন্ত্র কয়েকটি গানের সঙ্গে স্বতন্ত্র কয়েকটি নাচ নয়, গান ও নাচের সম্মিলিত বৈচিত্র্যের নতুন নৃত্যনাট্য। বিশেষ করে শেষ দু-টি নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' (১৯৩৮)-তে প্রেমের বেদনা ও সংঘাত, প্রচণ্ড টান ও অচরিতার্থতা আমাদের বিহ্বল করে তোলে এবং দীর্ঘ দগ্ধ পথ অতিক্রম করে তবেই পাই ক্ষমার কারুণ্য বা ক্ষমা করতে না পারার ক্ষমা প্রার্থনা। এই প্রশান্তির সাফল্যই স্মরণ করিয়ে দেয় আধুনিক অস্তিত্বের অশান্ত যন্ত্রণাকে। আসন্ন সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ কবি যেন তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা ও করুণাকে সংহতরূপে তুলে ধরেছেন এই দুই নৃত্যনাট্যে।

সুরের দিক থেকেও বোধহয় ঐ একই কথা। বেদনার প্রত্যক্ষ কারণটি গানের সুরে অনুপস্থিত; কিন্তু বেদনাটি ধ্রুব এবং সেটা ঠিক জেগে আছেই। বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন যে এককালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শতাধিক রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরিণত বয়সে সেটা কমতে কমতে পঁচিশ ত্রিশে দাঁড়িয়েছে। একে আকস্মিক মনে করার হেতু নেই; সঙ্গে সঙ্গে এটা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতারও প্রমাণ নয়। এর পিছনে আছে জীবনব্যাপী সাধনা ও বিশ্বাসের ভাঙাগড়ায় ক্রমপরিণতির ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত রাগরাগিণী ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি প্রধানত: ভৈরবী, বেহাগ, কেদার, পূরবী, মল্লার, কানাড়া ইত্যাদি। এগুলি মূলত বেদনারই সুর।

["ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা;" "কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ বিস্মৃতি;" "পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন;" "মেঘমল্লার যেন অশ্রুগংগোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল" ইত্যাদি।]

প্রথম জীবনের ভালোলাগার সামগ্রী পরিণত বয়সের ভাবানুষঙ্গে আরো গভীর ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রয়োগপদ্ধতিও হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। এখন তাঁর গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব থাকে কেবল দুটি দিক থেকে: এক, নানান গানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাগরাগিণীর বিচ্ছিন্ন অংশ বা রূপ; আর দুই, ধ্রুপদী শিক্ষার চরম ফল—আত্মদমন, যা "দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ" করে। নানা রাগরাগিণীর বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়-সাধন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অত্যাশ্চর্য দিক এবং তাতেই সম্ভবত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মেজাজের স্বকীয়তা। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ওস্তাদমহল সামান্য একটু-আধটু স্বরের পরিবর্তন করে কতো নাম তৈরি করেন এবং নতুন রাগিণী রচনার গৌরবে গর্বিত হন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সেভাবে বিচার করে যদি ব্যাকরণগত নিয়মে বাঁধা যায় তা হলে অন্তত কুড়ি পঁচিশটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একাজ সুরকার কবির করণীয় ছিল না, একাজ গায়কদের।" যে কোনো কারণেই হোক, একাজ আজও হয় নি। যদি হতো তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেজাজের অনেক বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ত।

একদা জীবনের মধ্যাহ্নে জীবন শুকিয়ে যাওয়ার তীব্র যন্ত্রণায় কবি করুণাধারার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এ অভিজ্ঞতা আরো ঘটেছে—তা আরো তীব্র, আরো অকরুণ। কিন্তু করুণাধারা নেমে আসে নি—তার কোনো সন্ধানই তিনি পান নি দেশ বা জাতির জীবনযাত্রায়, সহিংস বা অহিংস আন্দোলনে, অথবা মহৎ কোনো জীবনাদর্শে। গীতসুধা-রসই সেই করুণাধারা। তাই অজস্র গানে গানে ঐ লুপ্ত মাধুরীর সন্ধান। একদা কবির কাছে গানই ছিল পৃথিবীর ও নিজের মাঝখানের সেতু, পরে তাঁকেই গাইতে হলো:

"তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কতো আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।"

মর্মান্তিক এই বিরহের পরেই "মানব-অভ্যুদয়ে"র পদধ্বনি শুনতে পাওয়া সার্থক হয়, কুহেলিকা বিদীর্ণ করে সূর্যসন্নিভ নতুনের প্রকাশ মনে হয় আসন্ন।

অনন্তকুমার চক্রবর্তী

জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী

নাম দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী'। উদ্যোক্তা ললিত কলা
আকাদমি। কিন্তু ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি বছরেই আকাদমি-আয়োজিত
এই 'জাতীয়' প্রদর্শনী দেখে মোটের ওপর যে-ধারণা দর্শক সাধারণের হচ্ছে,
তা একটি খুব সরব প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট: এই সব ছবির মধ্যে
জাতীয়ত্বটুকু কোথায়? গুটিকয়েক বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ ছবিই
মডার্ন পশ্চিমী চিত্রকলার উৎকেন্দ্রিক ফর্ম-সর্বস্বতার অত্যন্ত খেলো অনুকরণ।
এই অনুকরণের মনোভাব কোথাও এসেছে মার্কিন-ফরাসী ট্যুরিস্টদের
পকেটের দিকে লক্ষ্য রাখার ব্যবসায়িক বক্রদৃষ্টি থেকে; কোথাও বা সেটা
এসেছে শুধুই ফ্যাশানদুরস্ত হবার মনোভাব থেকে। যাঁরা এই দুই শ্রেণীর
কোনোটিতে পড়েন না, এমন শিল্পী যে নেই তা নয়; কিন্তু এই প্রদর্শনীতে
তাঁদের অধিকাংশই উপস্থিত শুধু শিল্পভাষার বৈয়াকরণিক হিসেবে। তাঁদের
রচনার পেছনে এমন কোনো ভাব ও আবেগের আন্তরিকতা নেই যার স্পর্শে
রচনাটি সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর ভবনে সম্প্রতি ললিত কলা
আকাদমির উদ্যোগে দশ দিন ধরে যে জাতীয় চিত্র-ভাস্কর্যের বাৎসরিক
প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে যদি সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান
প্রবণতাগুলিকে উপস্থিত করা হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে
মোটের ওপর ভারতীয় চিত্রকলার বর্তমান অবস্থাটা বিশেষ আশাজনক নয়।
মোটের ওপর ইওরোপীয় চিত্রকলার হরেক মডানিস্ট ধারার অন্তঃসারশূন্য
অনুকরণই চলেছে দেশ জুড়ে—খুব অবিন্যস্ত-দৃষ্টি দর্শকেরও এরকম একটা
ধারণা হতে বাধ্য।

আমাদের দেশের এইসব আধুনিক শিল্পীরা কি তাঁদের নিজস্ব জাতীয়
শিল্পভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না? এবং তা পাচ্ছেন না বলেই কি এঁরা পশ্চিম-
ইওরোপীয় কলাকৈবল্যে এতখানি অভিভূত? অথবা, তাঁদের রচনা শুধুই
হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর্টের পেট্রন্‌দের রুচি অনুযায়ী—বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের
নিচে না হয়ে, তারই একটি হালফিল রকমফের—ড্রয়িংরুমের নিয়ন আলোর
নিচে নাচওয়ালীর অঙ্গভঙ্গী মাত্র? তা নইলে, যাঁরা শক্তিমান শিল্পী এবং

এক সময়ে সত্যিকার শিল্পসৃষ্টিই করেছেন, তাঁরাও এই ফ্যাশানের স্রোতে গা ভাসাচ্ছেন কেন?

প্রতিবারের মতো এবারেও এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি (চিত্রের সংখ্যা ১৩৬; ভাস্কর্য ৩৩টি; গ্র্যাফিক্স্ ২৩টি; মোট ১৯২টি দ্রষ্টব্য) দেখে এ সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ মাত্র করবে না যে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এসব ছবি রচিত হতে পারত। এসব ছবির রচয়িতার ভারতীয় হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। চিত্রকলার ভাষা সর্বজনীন হলেও, তার কি কোনো জাতীয় চরিত্র নেই? চারুকলা যদি তার জাতীয় ও আঞ্চলিক ট্র্যাডিশনের মূল উৎস থেকে রস আহরণ না করে, তাহলে তা কখনোই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে না। এই প্রদর্শনী তাই, গুটিকতক ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নিতান্তই বিজাতীয়।

আসলে, আমাদের আর্টের ক্ষেত্রে এই-যে আপন-সত্তাহীন কস্‌মোপোলিট্যানিজম্-এর উৎকট রক-'ন্-রোল চলেছে, একে উৎসাহিত করার পেছনে ললিত কলা আকাদমির কর্তাব্যক্তিদের অবদান বড়ো কম নয়। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল সম্বন্ধে, স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পকে নূতন এক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যাঁরা স্বপ্রতিষ্ঠ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে, আমাদের চিত্রকলার নিজস্ব ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নের ও নবরূপায়ণের বিষয়ে এই আকাদমির জেনারেল কাউন্সিলের গদিতে আসীন ব্যক্তিদের অনেকেরই অপরিসীম এক উন্নাসিক অবজ্ঞার কথা সুবিদিত। এ ছাড়া আছে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, স্বজনতোষণের মনোভাব—যে কথা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর মতো মডানিস্টদের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্রও ইদানিং একটু-অ[illegible]টু না বলে পারছেন না। এবারকার এই প্রদর্শনীর কথাই ধরা যাক: 'আমন্ত্রিত শিল্পী'দের রচনার মধ্যে আছে প্রবীণ ঠাকুর সিং-এর ('তাজমহলের সামনে রবীন্দ্রনাথ') আর রাওয়ালের ('আয় চাঁদ') অত্যন্ত স্থূল হাতের আঁকা খোকামীভরা কল্পনা-প্রসূত ছবি; কিন্তু নন্দলাল বা দেবীপ্রসাদের ছবি তো নেই-ই, এমন কি যামিনী রায়ও অনুপস্থিত। গোপাল ঘোষের ছবি শুনলাম নির্বাচক কমিটি অমনোনীত করেছেন—ধরে নিতে রাজি আছি যে ছবিটা হয়তো তেমন উৎরোয়নি। কিন্তু সতীশ গুজরালের অত্যন্ত বাজে ছবি-বাদ-দিয়ে মিডিয়ম নিয়ে পরীক্ষামূলক স্টান্টকে ('প্রিজনার') অথবা কুলকার্নির আড়ষ্ট ও দায়সারা ব্রাশ চালনাকে ('সাইলেন্ট কনভারসেশন') অমনোনীত করার সৎসাহস তাঁদের কোথায়? আর্টের দেউড়ির দ্বারপালরা যাঁদের প্রণামীতে

তুষ্ট, সরকারী-আধাসরকারী প্রসাদ বিতরণের বহুমুখী উৎসও তাঁদের জন্যে অবারিত।

অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্ আর্ট বলে কথিত কতকগুলি নিতান্ত নির্বোধ রচনাকে শুধু যে আদর করে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে তাই নয়, পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। হিম্মৎ শা-র 'মাই প্লে জিরো' (ক্যানভাসজোড়া হলুদ রঙের ছোপের ওপরে কয়েকটি বৃত্ত ও প্রায়-বৃত্ত), মানসারামের 'মিড্‌নাইট অ্যাফেয়র' (হালকা সবুজ রঙের ওপরে কয়েকটি এলোমেলো কালো রেখা) কিংবা বালকৃষ্ণ প্যাটেলের 'ইল্যুসিভ্‌ ডার্ক্‌নেস্‌' (ক্যানভাসের ওপরে শুধু বিদ্‌ঘুটে এক চাপড়া কালো আর ঘন নীল রঙ) ইত্যাদি ছবি বিশুদ্ধ ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রচারের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে যে সব শিল্পীকে 'নামজাদা' করে তোলা হয়েছে, সেই সব 'আমন্ত্রিত শিল্পী'দের অধিকাংশেরই অত্যন্ত বাজে কতকগুলি তৃতীয় শ্রেণীর কাজকে উপস্থিত করা হয়েছে। হুসেন, চাভ্‌দা, বাওয়েন প্রভৃতি যথারীতি ব্যক্তিগত-প্রতীকবহুল এমন সব অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্ বা আধা-অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্ ছবি দিয়েছেন যা রঙ-রেখা-কম্পোজিশন ও কল্পনা সব দিক থেকেই ফিকে আর ভোঁতা। আরও অনেকের স্থূল অনুকৃতির মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত তনুকৃত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন রুসো থেকে পল ক্লী, ব্রাক্‌ থেকে স্ট্যান্‌লি স্পেন্‌সর—এমন কি, স্যালভ্যাডর ডালি থেকে গুইগ্‌নেয়ার্ড্‌ পর্যন্ত অনেকেই!

ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য বেন্দ্রে, পানিকর, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিবাসালু প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পীর রচনা। বিশেষত পানিকরের রচনাটিতে ('ম্যান অন দি ক্রস') এবারে এক নতুন পদক্ষেপের লক্ষণ দেখে আমরা আনন্দিত। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ রচনায় উজ্জ্বল রঙের বিরোধ এবং পরিপূরক রঙ বর্জন এবারে আরও আকর্ষণীয় হয়েছে, বস্তুরূপের সংযত বিমূর্তনটুকু এসেছে রচনাটির সামগ্রিক দেশগত পরিবেশের সঙ্গে সুসমন্বিত হয়ে। পানিকরের এই রচনা রামকিঙ্করের রচনার স্মারক—যাঁর একটি সাম্প্রতিক কাজ ('কৃষ্ণজন্ম') এই প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। শ্রীনিবাসালুর 'মা ও ছেলে' পরম্পরাগত ভারতীয় লিনিয়রিজম্‌-এর একটি সার্থক আধুনিক প্রয়োগ। জ্যোতি ভাট-এর স্টেন্‌ড গ্লাস ধরনে উজ্জ্বল রঙে আঁকা 'লেডি উইথ এ বার্ড' প্যাটার্ন্‌-প্রধান একটি পরীক্ষা হিসেবে মনোগ্রাহী। কাইকো মোতির জল-রঙে জাপানী ঢঙের ছোপের কাজ 'দুটি প্যাঁচা' সুন্দর—

গগনেন্দ্রনাথের কাক-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। হেব্বারের রচনাটিতে ('এ সঙ ইন ইয়েলো') তাঁর লোকশিল্পানুপ্রাণিত শিল্পীমনের এবং সুদক্ষ ও কিছুটা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ রীতির পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে। জৈন-পুঁথিচিত্রণের ও উড়িষ্যার পটচিত্রের রূপরীতিকে কাজে লাগিয়ে তিনটি উপভোগ্য ছবি উপস্থিত করেছেন গৌতম ভাগেলা। তাঁর সুচারু ও সুনির্দিষ্ট রেখার ছন্দ খাঁটি দেশজ লিনিয়রিজম্‌-এর সমস্ত গুণগুলিকে আত্মস্থ করেছে এবং সেই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গভীরতায় ক্রমপ্রসারী রঙ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সমগ্র চিত্রপরিকল্পনায় বেশ একটা গতি সঞ্চারে সফল হয়েছেন। এইরকম পরাম্পরাগত রূপরীতির আধুনিকীকৃত সার্থক প্রয়োগের আরেকটি উদাহরণ ভগবান কাপুরের 'রুটিন'।

ভাস্কর্য বিভাগে প্রবীণ ভাস্করদের কয়েকটি পুরোনো আর পূর্বপ্রদর্শিত কাজ দেখতে পাওয়া গেল। কয়েকটি কাজ যথারীতি ফ্র্যাঙ্ক ডবসন আর হেনরি মুরের প্রায় হুবহু নকল। ধনপালের পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ক্রাইস্ট অ্যাণ্ড দি ক্রস' রচনাটিতে মডেলিং সুন্দর একটি সমাহৃত রূপ পেয়েছে—যদিও পরিকল্পনার দিক থেকে এটি একটু বেশি পরিমাণে স্থাপত্যধর্মী।

গ্র্যাফিক্‌স্ বিভাগটিকে সাধারণ ভাবে ভালো বলা যায়। এই বিভাগে কৃষ্ণ রেড্ডির 'হোয়র্ল্‌পুল' ও 'ওয়টর লিলিজ' রচনা দুটি কারুদক্ষতা ও রূপকল্পনার সমন্বয়ে মস্তবড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। এই বর্ণশোভাময় এচিং-এন্‌গ্রেভিং দুটিতে ক্যামিও আর ইন্‌ট্যালিও-র নানান্‌ প্রয়োগ-পদ্ধতির অত্যন্ত কল্পনাময় সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পী অপূর্ব কারুকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্র মজুমদার

তিনটি বিদেশী ছবি

সম্প্রতি কলকাতায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ বিদেশী ছবি প্রদর্শিত হয়েছে বা হচ্ছে। আমেরিকার 'এ্যাপার্টমেণ্ট', মেক্সিকোর 'মাকারিও' ও সোভিয়েত রাশিয়ার 'ব্যালাড অফ এ সোল্‌জার'।

প্রথম দুটি ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল। তখন দুটি ছবিরই সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ পরে পুনর্মুক্তির সময় দুটিই নীরবে উপেক্ষিত হয়েছে। প্রশ্ন জাগে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে কলকাতার জনসাধারণের উৎসাহ কি তবে নেহাতই সাময়িক ?

'এ্যাপার্টমেণ্ট' বিলি ওয়াইল্ডার পরিচালিত। আমেরিকার এই বিশেষ পরিচালকটি বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন ছবি করেন। তবুও কখনোই তাঁর ছবি ক্লাসিক পর্যায়ে ওঠে না। 'লস্ট উইক এণ্ড' ও 'স্পিরিট অফ সেণ্ট লুই'-এর পরিচালক এবার আমেরিকার বড়সাহেবী জগতের যৌন ব্যভিচারকে বিদ্রূপ করে তুলেছেন এই ছবিটি। এক কেরানী তার ঘরটি রাতের জন্য ধার দিয়ে বড় সাহেবদের সুনজরে আসে ও ক্রমশ পদোন্নতি করে। সারা রাত পার্কে বসে সর্দি লাগা ও পরদিনে গোটাপাঁচেক রুমাল নিয়ে অসংখ্য লোকের সঙ্গে পরের কয়েকদিনের ঘর ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করার দৃশ্যটি সত্যিই সুন্দর। মোটামুটি, পরিচালক সাহস ও সহজ-গতির সঙ্গে ছবি তুলেছেন। নায়কের চরিত্রে জ্যাক লেমন একটু অতি-অভিনয় করেছেন। নায়িকা শালি ম্যাকলেইন মন্দ নয়। হলিউডের ভালো পরিচালকের কাছেও এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না।

'মাকারিও' আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ চারটি ছবির মধ্যে একটি এ বিষয়ে কারও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। ইস্ট জার্মানীর 'প্রফেসর মাম্‌লক' (কনরাড উল্‌ফ্—মস্কো : গোল্ড মেডাল), ফরাসীদেশের Le Passage du Rhin (আদ্রে কায়াৎ—ভেনিস : গ্র্যাণ্ড প্রাইজ) ও পশ্চিম জার্মানীর Die Brucke (বার্নাড ভিকি)-র সমকক্ষ এই ছবিটি মেক্সিকোর গরীব কাঠুরে মাকারিওর গল্প।

না খেতে পাওয়া এ ছবির সমস্যা, মৃত্যু ও ক্ষুধা নিয়ে এক সত্যনিষ্ঠ রূপকথা এর কাহিনী। এক কাঠুরে মেক্সিকোর মৃত্যু-পরবের দিন স্থির

করে সে খাওয়া ছেড়ে দেবে, যতদিন না একটা পুরো টার্কি সে একা খেতে পায়। কারণ হিসেবে সে জানায়, সে কোনোদিন কিছু পায়নি বা চায়নি আর তাছাড়া তার ছেলেমেয়েদের পেট ভরাতেই তো তার সব শেষ হয়ে যায়। নিজে সে প্রায় অনাহারেই থাকে। তারপর শয়তান, ভগবান ও মৃত্যু তার চুরি করা টার্কির ভাগ চায়। শুরু হয় রূপকথা। মৃত্যু তাকে রোগ সারানোর ক্ষমতা দিয়ে যায়। আর, পরে এক গুহায় নিয়ে যায়—যেখানে অজস্র প্রদীপে মানুষের জীবন। নিজের প্রদীপ তুলে নিয়ে কাঠুরে মাকারিও যখন পালাচ্ছে, সে সময় মৃত্যু তাকে বারবার ফিরে ডাকে। এই ডাকই আস্তে আস্তে মাকারিওর স্ত্রীর ডাক হয়ে যায়। আমরা শুনি মৃত মাকারিওর স্বপ্নমগ্ন দেহের পাশে স্ত্রীর শপথ : "আমার ছেলেদের আমি তোমার মতো ভালো করে তুলব। তবে তারা হবে আরো সবল, শক্ত।" রবার্টো গাভাল্ডন্ ছবিটির পরিচালক। মাকারিও চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছেন Ignacio Lopez Jarso।

কানে ৬১তে 'লা দোলচে ভিতা'র একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'ব্যালাড অফ এ সোলজার'। মিথাইল রম্-এর শিষ্য গ্রিগরী চুখ্‌রাই ('ফরটি ফার্স্ট'-এর পরিচালক)-এর দ্বিতীয় ছবিটি তাঁর কাছে আমাদের অসীম প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে নি। ছবিটির নায়ক সোভিয়েত সাহিত্যের আদর্শ নায়কদের একজন। ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট' বা টলস্টয়ের নিকিতার সমকক্ষ এই বালকটি সত্যিই সোভিয়েত সভ্যতার প্রতীক হতে পারত। পরিচালকের কবিত্বময় হওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হওয়ায় এটা সম্ভব হয়নি। অথচ এ ধরনের কাহিনীর কবিত্বময় না হলে চলে না। পরিচালক প্রায় দভচেন্‌কোর অনুকরণে ব্রতী হয়েছেন মনে হয়। প্রথম দৃশ্যে ট্যাঙ্কের বিভীষিকা অবশ্য চমৎকারভাবে পরিস্ফুট। চুখ্‌রাই-এর শেষ ছবি 'ক্লিয়ার স্কাই'। মস্কো ফেস্টিভালে প্রথম পুরস্কার পাওয়া এই ছবিটি তাঁর দ্বিতীয় ছবির মতো নয় আশা করি। অবশ্য বক্তব্যে স্তালিনের সমালোচনা প্রাধান্য পাওয়ায় 'ক্লিয়ার স্কাই' অন্য কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করবে।

জিষ্ণু দে

পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ

ভোল্টিক সেল আবিষ্কারের ১৬৩ বছর পরে ভারতে বৈদ্যুতিক যুগের সূচনা। গত শতাব্দীর শেষ বছরে কলকাতাতেই সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না, শক্তির প্রয়োজন মেটাতে তেমনি আমরা আধুনিক উপকরণের উপর তেমন নির্ভর করতে পারি নি। এই শতাব্দীর প্রথম কয়টি দশকে বিদ্যুৎশক্তির বিস্তার খুবই স্তিমিত। বর্তমানে এক লোহা ও ইস্পাত শিল্পের মাত্র ছ'টি কারখানাতেই যে পরিমাণ বিদ্যুতের ব্যবহার, ১৯২৫ সালে সারা দেশের চাহিদা মিলেও তার বেশি ছিল না। ভারতে বিদ্যুতের যুগ অনেক দ্বিধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সূচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘটনার টানাপোড়েনে বিদ্যুতের প্রয়োজন অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু এই বিস্তার জাতীয় অর্থনীতির পরিপোষক হয় নি। সাময়িক উন্মাদনার ঊর্ধ্বে কোনো বৃহৎ পরিকল্পনার স্তরে তার প্রতিষ্ঠা ছিল না। বিদ্যুতের প্রসার তাই ব্যাহত হলো। যুদ্ধের পরবর্তী ক্ষণে পৃথিবীব্যাপী দারুণ মন্দায় বড়ো বড়ো অনেক শিল্প মূলহীন বনস্পতির মতোই ক্ষয় পেতে থাকে। বিদ্যুতের উৎপাদন হারও তখন কমে যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন, মোট উৎপাদনীক্ষমতা মাত্র ১৩·৩ লক্ষ কিলোওয়াট। হিসাবটা অবশ্য ১৯২৫ সালের চারগুণ। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাধারণত প্রতি আট থেকে দশ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সে হিসাবে আমাদের এই অনগ্রসর দেশটিও বিস্তারের হার বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এহ বাহ্য। এভাবে হিসাব সঠিক দেখায় বটে কিন্তু পাকা হয় না। হিসাবের ফাঁকটা আমরা যেন ফাঁকি না দিই। আসল কথা, ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রসার ঘটেছে ৩·৩ থেকে ১৩·৬, বাইশ বছরে মাত্র দশ লক্ষ কিলোওয়াট। স্পষ্টতই, বিদ্যুতের যুগে বাস করেও আমরা তার অপরিমেয় শক্তি কাজে লাগাতে পারি নি।

বিদ্যুৎ বর্তমান শিল্পজগতের মূলকেন্দ্রে গিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। পরমাণুর পরে তা শক্তির সর্বাধুনিকরূপ, শান্তির কাজে নিয়োজিত হলে পারমাণবিক শক্তিও বিদ্যুৎরূপেই প্রধানত বিলসিত হবে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও তা সারা পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটাতে একমাত্র হিসাবে দেখা দেয় নি,—গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ কোনো থামের যতই গুরুত্ব থাক না একটিতেই সমস্ত প্রয়োজন মেটে না। শক্তির ভিন্নতর রূপে উত্তাপ শিল্প ও যান্ত্রিকতার মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন জাতের কয়লা তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে এই তাপশক্তি সংগৃহীত। বিদ্যুৎশক্তির একটি প্রধানভাগও উত্তাপ থেকেই আবর্তিত হয়ে থাকে। তাপ পৃথিবীর আদি শক্তি। স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ তা আয়ত্তে আনতে শিখেছে। কিন্তু তখনো খনিজ জ্বালানীর আবিষ্কার হয় নি। বনজাত কাঠ এবং জীবজন্তুর পরিত্যক্ত জিনিস পুড়িয়েই মানুষ শক্তির প্রয়োজন মেটাতো। কিন্তু বিংশশতাব্দীর এই মধ্যভাগে এসেও দেখি সে-সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক উপায় বর্জিত হয় নি। ১৯৫৭ সালে কাঠ এবং ঘুঁটে সারা পৃথিবীর মোট চাহিদার শতকরা ১৭ ভাগই পূরণ করেছে। আফ্রিকা দক্ষিণপূর্ব ও মধ্যপশ্চিম এশিয়ার অনগ্রসরতাই পরিসংখ্যানকে এত উঁচু আসনে বসিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের দিকটাও কম নয়। ১৮৯৮ সালে দেশে যখন বিদ্যুতের প্রসার ঘটে নি, মোট প্রয়োজনের প্রায় ৯৫ ভাগই আসত কাঠ ও ঘুঁটে পুড়িয়ে; ঘুঁটেই প্রধান ভাগ—৯০ শতাংশ। কয়লার অংশ বাকি পাঁচ ভাগ মাত্র। বিদ্যুতের যুগ সূচনার পঞ্চাশ বছর পরে অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৭ সালের হিসাবে কয়লার ব্যবহার অনেক বেড়েছে—শতকরা একুশ ভাগ, কিন্তু কাঠ বা ঘুঁটে পুড়ছে ৭৮ ভাগের কম নয়। এ সময় দেশের মোট প্রয়োজনের শতকরা দেড় ভাগ মাত্র বিজলী শক্তি। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই নিদারুণ অসঙ্গতি ও বিরোধ সহজেই লক্ষণীয়।

কিন্তু আসল অবস্থা যেন আরো খারাপ,—চলতি কথায় শাঁখের করাতের মতো। আর একটি বিষয়ের বিবেচনায় তা স্পষ্ট হবে। ঘুঁটের কার্যকারিতা মাত্র পাঁচ শতমিক (দশমিকের অনুসরণে শতমিক বলতে শতাংশ বোঝাতে চাইছি, পাঁচ শতমিক শতকরা পাঁচ ভাগ), কাঠের আরো কম। তার মানে, কাঠ বা ঘুঁটের আগুন অনর্থক ছাই ও ধূম সৃষ্টি করে

বেশির ভাগই অকাজে ছড়িয়ে পড়ে,—পর্বতের মূষিক প্রসবের সঙ্গেই এর তুলনা। ১৯৪৭ সালে জ্বালানীর কাজে এক ঘুঁটেই পুড়েছিল আনুমানিক পঁচিশ কোটি টন। বিদ্যুতের প্রসারের ফলে এই পৌরাণিক উৎসটি যদি গোবর হিসাবে ক্ষেতে প্রয়োগ করা যেত, সারের প্রাচুর্যে দেশের শস্যোৎপাদন নিশ্চয়ই যেত বেড়ে। একদিকের অসামঞ্জস্য এভাবে আর একদিকে পিছুটান দিচ্ছে।

পরাধীন অবস্থায় স্বভাবতই পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এদিকে দেশনায়কদের দৃষ্টি পড়ল। পাঁচ বছরের পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের কথা উঠল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালে। ইতিমধ্যে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন দশ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিকল্পনার লক্ষ্য ৩৮ লক্ষতে নির্দিষ্ট হলো। কিন্তু কার্যকালে এই উদ্দেশ্য পূরণ হয় নি। ১৯৫৬ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৪'২ লক্ষ কিলোওয়াট। ঘাটতির পরিমাণ সামান্য হলো না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও প্রাথমিক সংকল্প খাটো করে সাজাতে হয়েছে। মূল লক্ষ্য ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট, কিন্তু বিদেশী মুদ্রা ও যন্ত্রপাতির অভাব দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ১২ লক্ষ কিলোওয়াট কম নির্ধারিত হলো। ১৯৬০ সালে ভারতে বিদ্যুৎপরিমাণ ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ১১৮-তে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ যে কার্যকর হবে এখন থেকেই নিশ্চিত নয়। আসল কথা বিদ্যুৎশক্তির বিকাশে আমরা যেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারি নি। গঠনমূলক পর্যায়ে অজস্র প্রকারের অসুবিধা থাকে, কিন্তু বিদ্যুতের অভাব তার পরিমাণ বাড়িয়েই তোলে মাত্র। জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যুতের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ করা তাই বিবেচনার কাজ হবে না। পৃথিবীর প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশ এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। আমেরিকা বৃটেন ফ্রান্স নরওয়ে ইত্যাদি দেশের শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করলে এ সত্যই বেরিয়ে আসে। ১৯১৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তের পর রুশ চিন্তানায়ক লেনিন নূতন মতবাদের সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি বিকাশের প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। Communism is Soviet Power plus Electrification of the whole country—তাঁর এই উক্তি বিখ্যাত ছিল। সোভিয়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা সে অনুসারে বিন্যস্ত হলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ার পক্ষে এ

সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করা কম আয়াসসাধ্য ছিল না। কিন্তু লেনিনের দূরদৃষ্টি আজ আর কেউ প্রশংসা না করে পারেন না।

আমাদের পরিকল্পনার রচয়িতারাও শিল্পোন্নয়নের এই ইতিহাস যথেষ্ট বিস্তার ও বিবেচনার সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু পরিকল্পনার চেয়ে সংগঠনিক বিশৃঙ্খলার জন্যই প্রধানত বিদ্যুতের বিস্তার প্রয়োজনের তুলনায় তেমন অগ্রসর হতে পারে নি। বৈদ্যুতিক উৎপাদন-যন্ত্র বসাতে সাধারণত বছর চার সময় নেয়। কিন্তু আমাদের দেশে পরিকল্পনার পর্যায় থেকে পুরোপুরি গড়ে তোলা আট বছরের কমে হয় না। এ জন্য যে বাড়তি ব্যয় স্বীকার করতে হয় তা বলা বাহুল্য। বর্তমানে কোনো উন্নয়নমূলক কাজের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা করেন রাষ্ট্রীয় সরকার। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরে তার পুনর্বিবেচনা হয়। কাজটির গ্রহণযোগ্যতা, আনুমানিক ব্যয়, অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের হাতে। পরিকল্পনার পূর্ণচিত্র এভাবে রচিত হয়ে থাকে। মূল উদ্দেশ্যের ত্রুটি নেই, কিন্তু পরিকল্পনার স্তরেই এখন অনেক সময় অতিবাহিত হচ্ছে। তা ছাড়া চূড়ান্ত বিবেচনার পরও মুদ্রা ঘাটতির ডামাডোল পেরিয়ে বিদেশী যন্ত্রের আমদানিতেও কম সময়ক্ষেপ হয় না। সমস্ত পরিকল্পনার কাঠামোই তাই ঝাঁকানি খাচ্ছে। বিদ্যুতের উৎপাদন যেখানে শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রসর থাকার কথা ছিল কার্যত তা-ই পেছিয়ে পড়েছে। তৃতীয় যোজনাকালে আমাদের যে বিদ্যুতের প্রয়োজন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেই তা তৈরি থাকা উচিত ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হতে না হতেই নূতন চাহিদা আবার দেখা দেবে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন এভাবে উল্টোমুখী ঘোড়ার মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

পরিসংখ্যান-নির্ভর গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করে ভবিষ্যতের চাহিদা সহজেই নিরূপণ করা যায়। সেই অনুসারে মোটামুটি কার্যসূচী স্থির হয়েছে, পরিকল্পনার সূক্ষ্মতা যথাকালেই সম্পন্ন হবে। যা হিসাব হয়েছে, পঁচিশ বছর পরে ভারতে বিদ্যুতের পরিমাণ পাঁচ কোটি কিলোওয়াট-এর সীমা অতিক্রম করবে। এর ফলে কয়লার উপর যে চাপ পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের শতকরা প্রায় ষাট ভাগই কয়লাজাত উত্তাপ থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। সর্বাধুনিক সমীক্ষার ভিত্তিতে

দেশের মোট কয়লার সঞ্চয় ৬০০০ কোটি টন। বর্তমানের চাহিদা অনুসারে তা আগামী প্রায় দেড় শ বছরের চাহিদা মেটাতে সমর্থ। কিন্তু বিদ্যুতের ব্যবহার প্রতিদিনই বাড়ছে। স্বাধীনতার পরবর্তী মাত্র চৌদ্দ বছরে এই বৃদ্ধি চার গুণেরও কিছু বেশি। এ সত্ত্বেও বর্তমানে বিদ্যুতের জনপড়তা হিসাব আমেরিকার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কালক্রমে অবস্থার যখন উন্নতি হবে কয়লার ব্যবহারও সেই সঙ্গে বেড়ে যাবে। আমেরিকার বর্তমান হারে খনিজ সম্পদ ফুরোতে পনেরো বছরের বেশি লাগবে না। নূতন আরো খনির আবিষ্কার সম্ভব হলে কালের সীমা বড় জোর আরো নয় বছর দশেক বাড়লো। মোট পঁচিশ বছর। এমন নিদারুণ সমস্যা অবশ্য আমাদের আপাতত নেই—কয়লা আমরা অনেক "বাঁচাচ্ছি", কিন্তু সমস্যা প্রকট হতে আর কত দিন। জ্বালানীর সঞ্চয় ক্রমবৃদ্ধিহারে ক্ষয় পাচ্ছে। ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ প্রয়োজনে কয়লার উপর বেশি নির্ভর করা তাই সুযুক্তির পরিচয় হবে না।

রাশিয়া বা আমেরিকায় গ্যাস ও তেল পোড়ানো উত্তাপ থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। তেল পরিবহনের কাজেই প্রধানত ব্যয়িত হবে। এদিকে ওদিকে যে দু-চারটি গ্যাসের উৎস রয়েছে তার মধ্যে আসামের নাহারকাটিয়ায় সম্প্রতি ৫০ হাজার কিলোওয়াট আয়তনের এক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসানো হচ্ছে। কিন্তু একটি কি দুটি নক্ষত্র রাত্রির কতটা আঁধার দূর করতে পারে। বিদ্যুতের প্রয়োজনে তেল বা গ্যাসের অবদান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতে জলবিদ্যুৎ শক্তির বিকাশ। জলের আবর্ত থেকে এখানে বিদ্যুৎ মথিত হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালে মহীশূর রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৬ ভাগই জলশক্তি থেকে সংগৃহীত। ভারতে জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা চার কোটি কিলোওয়াট। কিন্তু বন্দর পত্তনের মতো জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনেও প্রকৃতির আনুকূল্য ছাড়া যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ হয় না। ভারতের অনেক নদীতেই পর্যাপ্ত জল সম্বৎসরকাল প্রবাহিত না হওয়ায় বাঁধ ও জলাধার তৈরি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক সময় আবার জলবিদ্যুতের সম্ভাব্য উৎস শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এ সব ক্ষেত্রে কয়েক শ কিলোমিটার

তার টেনে আনার বাড়তি খরচ আছে। তবে এ জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক ব্যয়ই প্রধান কথা, চলতি ব্যয় সামান্য মাত্র—মোটামুটিভাবে কয়লার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ১৯৬১ সালে জলবিদ্যুতের পরিমাণ ২১ লক্ষ কিলোওয়াট, তৃতীয় যোজনার শেষে তা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। ইতিমধ্যেই দেশের সুবিধাজনক উৎস অনেকগুলি কাজে লাগানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব, আগামী পঁচিশ বছরে মোট সম্ভাবনার অর্ধেকের বেশি অংশ কার্যকর করা ব্যয়সঙ্গত হবে না। বিদ্যুতের সম্ভাব্য প্রয়োজন জলশক্তির উপর নির্ভর করে তাই বেশি দিন স্থির থাকতে পারে না।

সমস্যা এখনি ঘনিয়ে আসে নি বটে, কিন্তু শক্তির নূতন উৎস সন্ধানে আমাদের এখনই তৎপর হতে হয়। পরমাণুর যুগে পরমাণু অবশ্য রয়েছে, তার রহস্যময় গর্ভে যে অসীম শক্তির সঞ্চয় তাকে উত্তাপের আকারে বাইরে টেনে বিদ্যুৎ হিসাবে নিয়োজিত করা। পরমাণুর বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে তা সফলও হয়েছে। এটম থেকে ইলেকট্রিসিটি সামান্য কথা নয়, অনেক জটিল তত্ত্ব ও কারিগরি কৌশলের মধ্যে পরমাণুজাত বিদ্যুৎ সফল হয়েছে। এজন্য প্রধান উপাদান য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়াম। ভারতে দুটিরই প্রচুর সঞ্চয়। য়ুরেনিয়াম-এর পরিমাণ ১৫ হাজার টন, থোরিয়াম ১৫০-১৮০ হাজার। সমৃদ্ধ আকরিকগুলিই শুধু আমরা হিসাবে ধরেছি। নূতন অনুসন্ধানের ফলে এই পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমান পর্যায়ের কারিগরি কৌশলে এক টন য়ুরেনিয়াম দশ হাজার টন পর্যন্ত কয়লার কাজ করতে পারে। কালক্রমে এই ক্ষমতা আরো প্রসারিত হবে—এক টন থেকে লক্ষ গুণ কয়লার কাজ আদায় করা তখন বোধ হয় অসম্ভব হবে না। শক্তির যে অসামান্য উৎসটি আমরা পেলাম তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতও তার শক্তিসমস্যার সমাধান পরমাণুর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে।

এই পরমাণুকে কাজে লাগানো সহজ কথা নয়। প্রথমেই, জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো বেশ সবল থাকা চাই। পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রাথমিক যে ব্যয়ভার, কয়লার তুলনায় তা কয়েকগুণ। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে আরো অনেক বাড়তি খরচের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পরমাণুর ক্ষেত্রে এমন অনেকগুলি জিনিসের প্রয়োজন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাদের ব্যবহার নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্বে বিশেষ কারখানায় এ সমস্ত উপকরণ আগেভাগেই তৈরি থাকা চাই। এত বিরাট প্রস্তুতি অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে সম্ভব

হয় না। তা ছাড়া, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা যে পরিমাণে জটিল,
নিপুণতাও সে অনুসারে নিখুঁত হওয়া চাই। সে সঙ্গে জীবদেহে পরমাণুর
বিষক্রিয়ার কথাও ভুললে চলবে না। এ সব সত্ত্বেও পরমাণুকেই আমাদের
গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে বৃটেন তাদের মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের
আধাআধি পরমাণু থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। আমাদের অবশ্য এত
বড়ো পরিকল্পনা নেই, আপাতত তার প্রয়োজনও নেই। তবে ভবিষ্যতের
জন্য প্রস্তুত হতে হয় বই কি। তৃতীয় যোজনাকালে পরমাণুবিদ্যুৎ উৎপাদনের
কাজ শুরু হয়েছে। বোম্বের ১০০ কিলোমিটার দূরে তারাপুর, ১৯৬৫
সালের মধ্যে সেখানে দুটি উৎপাদন কেন্দ্র বসানো হবে। মোট তিন লক্ষ
কিলোওয়াট। সে সঙ্গে ভারত যথার্থই পরমাণুর যুগে এসে উপনীত হবে।

এভাবে আমাদের শক্তি-প্রয়োজন প্রধানভাবে যখন ঘুঁটে পুড়িয়ে নিষ্পন্ন
হয়, পরমাণুকেও আমরা জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এলাম।
ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মতো নূতন এক অসামঞ্জস্যের যেন সৃষ্টি হলো। কিন্তু
পরিকল্পনার মধ্যে সমস্ত বিন্যাসের অবসর রয়েছে। পরমাণুর বিদ্যুৎ
কয়লাজাত বিদ্যুতের মতো পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নয়, শক্তির
যে অংশটা সর্বদাই প্রয়োজন হচ্ছে তার জন্যই তা কার্যকর। নূতন বিদ্যুতের
এই খণ্ডিত উপযোগিতা আছে। সে সঙ্গে উৎপাদনের আয়তনও বিরাট
হওয়া চাই, নচেত ব্যয়বাহুল্য এসে পড়ে। বিস্তৃত চাহিদার সৃষ্টি না হলে
পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানো সুলভ হয় না। তার মানে, বড়ো বড়ো অনেক
কলকারখানা থাকা চাই যেখানে দিনরাত সমানে কাজ চলছে। গার্হস্থ্য
প্রয়োজন পরিবর্তনশীল, পরিমাণেও সামান্য মাত্র (মোট প্রয়োজনের শতকরা
১১ ভাগ)। পরমাণুর শক্তিকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে হলে তাই বিভিন্ন
শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক পরিচলন ব্যবস্থা (Transmission) চালু
রাখা চাই। প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে রয়েছে পরমাণু (বা কয়লা)
জাত বিদ্যুৎ। পরিবর্তনশীল প্রয়োজনে জলবিদ্যুৎ বা ইঞ্জিন চালিত শক্তি
কাজে লাগানো হবে। কিন্তু এই নিপুণ বিন্যাস ব্যাপক পরিকল্পনার ফল।
ভারতের মতো বিরাট দেশে তা কার্যকর করা সহজ কথা নয়। য়ুরোপীয়
সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে এই যোগসূত্র বিস্তার করেছে।
ফলে দেশের দূরতম কেন্দ্রেও যদি কখনো উৎপাদন ব্যাহত হয় স্থানীয় চাহিদা
মেটাতে অসুবিধা হবে না, অন্য স্থানের উদ্‌বৃত্ত অংশ সহজেই ব্যবহার করা

চলবে। পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও আমাদের বৈদ্যুতিক উন্নয়নগুলি আঞ্চলিক সীমানার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। দামোদর উপত্যকার কর্মযোজনা এর ব্যতিক্রম মাত্র। মোট উৎপাদন বিহার ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে। মহানদী পরিকল্পনার হিরাকুদের বিদ্যুৎও ক্রমে এ সঙ্গে মিলিত হবে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এভাবে একটি বিদ্যুতের সংযোগক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ১৯৬১ সালের প্রারম্ভে শিল্পাঞ্চলিক কলকাতায় যে অভাবনীয় বিদ্যুৎঘাটতি দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ না থাকলে তা আরো দারুণভাবে অনুভূত হতো। সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরিচলন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের জন্য শক্তির প্রয়োজন যেখানে বরাবরই রয়েছে, বর্তমানে তা অনেক আয়তনে পরমাণু বিদ্যুৎ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হয়ে রইল।

পরমাণু শক্তির উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যয় বাহুল্যের দিকটা অবশ্যই এক বিরাট সমস্যা। দেশের এই গঠনমূলক পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতির উপর তা সবিশেষ চাপ দেয়, কিন্তু কোনো কারিগরি কৌশল আয়ত্ত করতে হলে এই ব্যয়ভার গ্রহণ না করে উপায় নেই। অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। কয়লার খনি থেকে দূরবর্তী ভারতের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে উৎপাদনের ব্যয় এখনই অপেক্ষাকৃত কম। অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ স্বাভাবিক সীমায় চলে আসবে। কিন্তু ব্যয়ভারের থেকে যে কথা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ: আমরা শক্তির একটি নূতন উৎস আয়ত্ত করতে যাচ্ছি। পনেরো কি বিশ বছরের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রধান ভাগ পরমাণু থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। কয়লার দিন প্রায় ফুরল। প্রাথমিক ব্যয়ভার তাই স্বীকার করে নিতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনা সে অনুসারে উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করে নিচ্ছে।

অশোককুমার দত্ত

কবিতার কথা

টেনিসনের ইউলিসিস কোন্ মায়ামন্ত্রে টি. এস. এলিয়টের হাতে গেরন্‌শিয়ন্ হয়ে উঠল লরেন্‌স্ ডারেল-এর কাছে এইটেই প্রশ্ন। তাঁর বিশ্বাস, "সত্যিকারের মহৎ কবি উক্তির দামেই আধুনিক, বলার ঢঙে নয়।" তাছাড়া "যে প্রিজম্-কে আমরা কৃষ্টি বলে থাকি, সাহিত্য তারই এক মুখ।" টেনিসন্ ও এলিয়টের পার্থক্য আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে নয়, অন্তর্লীন মূল্যবোধের বিরাট বিবর্তনে। ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও অভিব্যক্তিবাদে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ও ফ্রয়েড-এর স্বপ্নতত্ত্বের আবির্ভাবে সেই পরিবর্তন চিন্তারাজ্যে বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায়। সেই বিপ্লবের গর্ভেই আধুনিক ইংরেজি কবিতার জন্ম। এ কবিতার দুর্বোধ্যতা, অসংলগ্নতা ও আপাত-বিশৃঙ্খলা আইনস্টাইন-নির্দেশিত দেশ-কাল-সন্ততির কাব্যরূপ। এ কবিতার প্রতীক ও রূপকল্পের ব্যঞ্জনার পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিককুলের সর্বদা উপস্থিতি। কাল ও ব্যক্তিমন, এই দুই বিন্দু থেকেই আধুনিক কবিকুলের নিত্য যাত্রা। আসলে তাই বিশ্বলোক দর্শনের পরিবর্তনেই কবিতার রূপান্তর। এ ব্যাখ্যায় আধুনিক কবিতার প্রায় যাবতীয় চরিত্রগত গুণের দায়-দায়িত্ব ফ্রয়েড-আইনস্টাইনের উপর অর্শায়। ফলত, অতি সরলীকরণের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ডারেল সে সম্পর্কে সচেতন, বারে বারে কৈফিয়ৎ শোনানোয় তাঁর বিরাম নেই।

কাল নিরবধি, কাল অবিভাজ্য, কাল স্রোতোবহা—এই নতুন চেতনা এলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কিংবা পাউণ্ড-এর ক্যাণ্টো-পর্যায়ের অন্যতম উৎস। এই নব কালচেতনার কৃপায় চসার-এর মধুবর্ষী স্বর্ণপ্রসবা সেই আদি এপ্রিল অবচেতনের স্মৃতিভার থেকে উঠে এসে এলিয়ট-এর নিঠুরতম এপ্রিলের অর্থময় চিত্র রচনা করে। প্রতি মুহূর্তে অনাদি অনন্ত সর্বকাল—কাল অস্তিত্ব

Key to Modern Poetry, Lawrence Durrel. Rupa & Co., Calcutta. Rs. 5/-

(আক্ষরিক অর্থে)—এই আইনস্টাইনীয় তত্ত্ব স্মরণ করেই এলিয়ট লিখতে পারেন :

"বর্তমান কাল আর গতকাল উভয়ে বুঝিবা
বর্তমান ভাবীকালে
আর ভাবীকাল ভাব্য অতীত জঠরে।
যদি সর্বকাল থাকে চিরকালই বর্তমান
অমোচ্য সে সর্বকাল শূন্য আশাহীন।" [বিষ্ণু দে-র অনুবাদ]

টাইরেসিয়াস্, প্রুফ্রক্ প্রমুখ অসংখ্য নিউরটিক, ভাঙা-মানুষ হয়ত ফ্রয়েড-এরই কারখানায় গড়া। তবু বারবার স্মরণীয়, এ শতকের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস—সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা, লয়েড জর্জের সুচতুর ভাঁওতার চাল সত্ত্বেও উত্তাল বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, উপনিবেশে বিদ্রোহ, শেষে বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রাক্কালেই সংকটের ইতিহাসে যুদ্ধের সংকেত স্পষ্ট। মহাযুদ্ধের পরে সংকট রয়েই গেল। যুদ্ধের ময়দানেই তরুণ কবি উইলফ্রিড ওয়েন-এর মৃত্যু যেন কোনো আর্কিটাইপাল কবির মৃত্যু বলে মনে হলো। সংকটের কালের মানুষ শেষে যখন অসহায় অসহনীয়তায় গিয়ে পৌছল, তখন সামনে এক পথ—মৃত্যুকে জানো, নির্বাণ খোঁজো। অনেক তো দেখা হলো, একটা জীবনের মধ্যেই অসংখ্য মৃত্যুকে দেখা গেল, সামনে শুধু বার্ধক্য, সে দায় কেমন করে সইব? "কিউমি-তে সিবিল্-কে দেখলাম, বোতলের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। বাচ্চারা জিজ্ঞেস করল: সিবিল, তুমি কি চাও? সে বলল, আমি মরতে চাই।" ক্ষুদে বুড়ো গেরন্‌শিয়ন্, কিংবা "হারি আপ্ প্লীজ ইট্‌স টাইম্"—কিংবা:

"বুড়ো মানুষ তো নেহাৎই ঠুনকো,
ভাঙা কঞ্চির মাথায় ছেঁড়া কোট, যদি না
আত্মাটা হাতে হাতে তালি দিয়ে গান গেয়ে ওঠে"...[য়েট্‌স থেকে]।

ধ্বংসস্তূপের চেতনা, বার্ধক্য ও মৃত্যুর চেতনা—এই চেতনার সাক্ষাতেই কবিতার ভাষা ভেঙে গেল, সাবেকী ছন্দ ভাঙল—সাবেক কালটাই যখন ভেঙে গেছে, তখন ওদের বেঁধে রেখে লাভ নেই। সাহিত্যের অতীত ইতিহাসে তখন আত্মীয় স্বরূপ ডান ও হপকিনস, দু-জনেই নিউরসিস-এর কবি, মর্ত্যচেতনা ও লোকোত্তরের দুর্বিষহ টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় দশকের কবিদের কাছে ডান বলতে অমিত রায়ের ডান নয়, 'হোলী সনেটস' -এর ডান। লিউইস ক্যারল-এর ভাষা নিয়ে ভাঙাচোরার উত্তরাধিকার নতুন কবিদের পরীক্ষায় সমৃদ্ধতর হলো। মিল্টন, ল্যাম, আর্নল্ড-এর হাতে মুক্তছন্দ পরীক্ষার

বস্তু ছিল ; পরীক্ষা এবার প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো। পুরনো ঐতিহ্যের ভাঙা টুকরো দিয়ে ধ্বংসের বিরুদ্ধে বাঁধ বাঁধবার প্রয়াসেই সমালোচক ও কবি এলিয়টের সাধনা শুরু হলো। এলিয়টের কবিতায় তাই অহরহ নতুন পুরনোর তুলনা—ফীনীশীয় নাবিক, বণিক, মিষ্টার সিল্‌ভেরো, হাকাগাওয়া, ডোরিস-স্থউইনিদের সঙ্গে পুরনো সাহিত্যের চরিত্র ও এলোমেলো ছন্দের স্মৃতি। ঐতিহাসিক কারণেই যে যুগান্ত-চেতনার জন্ম হয়েছিল ; আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, বার্গস প্রমুখের তত্ত্বের কোনো কোনো দিক সেই চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম চার অধ্যায় জুড়ে আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ও গ্রোডেক-এর তত্ত্ব আলোচনা করে ১৮৯০-এর যুগ থেকে কবিতার ইতিহাস শুরু ; এ শতকের তৃতীয় দশকের শেষেই সেই ইতিহাসের শেষ। এলিয়ট সাহেবের বিধান মানলে ['অন্‌ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড পোয়েটস' প্রবন্ধ সঙ্কলনে 'য়েটস' (১৯৪০) প্রবন্ধে] প্রতি বিশ বছর অন্তর কবিতার যুগ বদলায়। তাই ১৮৯০ থেকে ১৯৩৯-এর কবিতাকে 'আধুনিক' বলা চলে কিনা, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠবে। তবু, এযুগে বসে ওযুগের কবিতার আলোচনার মূল্য আছে। আশা করেছিলাম, পঞ্চাশের দশকে ইংরেজ সমালোচকদের কাব্যবিচারে যে দিকপরিবর্তন ঘটে গেছে, ডারেল-এর আলোচনায় তার সাক্ষ্য মিলবে। সে আশা পূর্ণ হয় নি। ১৯৪৮ এ লেখা এই বই ; ১৯৬১ সালের নতুন সংস্করণে একে কালোপযোগী করার কোনো চেষ্টা হয় নি।

"ডি. এ্যচ. লরেন্‌স্‌ মাঝে মাঝে উৎরে যান···মাঝে মাঝে মহত্ত্বের মুহূর্তের আস্বাদও পেয়ে যান ; তবু বড় অক্ষম লেখক।" কথাটা যাঁর, ভর্জিনিয়া উল্‌ফ-এর ডায়েরিতে তাঁর নাম টম (অর্থাৎ, টমাস স্টার্নস্‌ এলিয়ট)। এলিয়ট জানতেন না যে, তাঁরই জীবৎকালে বৃদ্ধবয়সে শুনতে হবে, "কবি হিসেবে লরেন্‌স্‌ এলিয়টের চেয়ে অনেক বড় প্রতিভা" (কলকাতায় কবি-সমালোচক ডি. জে. এন্‌রাইট-এর ভাষণ, স্টেটস্‌ম্যান্‌-এ উদ্ধৃত)। নতুন কাব্যবিচারে, য়েটস্‌ ও লরেন্‌স্‌ কবি হিসেবে এলিয়ট ও তাঁর উত্তরসূরীদের অনেক ওপরে স্থান করে নিয়েছেন। এটা কোনো সাময়িক ভালো লাগা না-লাগার খেলা নয়। বিগত দশকের কাব্যবিচারে এ মতের তাত্ত্বিক সমর্থন আছে। এর তাত্ত্বিক সমর্থন এলিয়টের প্রবন্ধেও আছে, আর ১৯৩৮-এ প্রকাশিত ম্যাক্‌নীস-এর প্রবন্ধেও ('এসেজ অ্যাণ্ড স্টাডীজ' প্রবন্ধবার্ষিকীর পাতায়)।

দর্পণ আলোকশিখা হয়ে উঠুক, দর্শন হোক—তবেই কবিতার মহত্ত্ব। কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় উপলব্ধি হোক। দার্শনিক কিংবা রাজনৈতিক কোনো তত্ত্ব, স্বরচিত কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনবেদ হোক—এমনি কোনো গভীর প্রত্যয়ের সহায়তা ছাড়া কোনো একা কবির সার্থকতায় পৌঁছবার শক্তি নেই। অভিজ্ঞতাকে প্রত্যয়ের ভূমিতে রোপণ না করলে, কোনো জীবনবেদের সঙ্গে যুক্ত না করলে, কবিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মরা 'ফর্ম', গতানুগতিকতা, ও স্টক্‌ রেস্‌পন্‌স্‌-এর চোরাবালিতে। আয়র্ল্যাণ্ডের লোককথা, আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আয়র্ল্যাণ্ডের মনের আশ্চর্য মেজাজের উপর য়েটস্‌ তাঁর 'গায়ার্স্‌'-এর ইতিহাসদর্শন স্থাপন করেছিলেন। অলিভার গ্যাগার্টির রোমহর্ষক জীবনের সঙ্গে য়েটস্‌-এর যোগ ছিল—সে জীবনের কাব্যময়তা য়েটস্‌ স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেছিলেন—"এমন এক দেশ যেখানে জনজীবন সরল অথচ উত্তেজনার তারে বাঁধা, সেই দেশের জনজীবনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থেকেছি বলেই আমরা এইরকম হয়ে উঠেছি।" য়েটস্‌-এর চিত্রকল্প আইরিশ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিরাট মহাদেশ থেকে তার অনুরণন তুলে নেয়, য়েটসীয় ইতিহাসদর্শনের অর্থের যোগে আরো অর্থময় হয়ে ওঠে।

জেসি চেম্বার্সের ('সান্‌স্‌ অ্যাণ্ড লাভার্স'-এর মিরিয়াম) সঙ্গে সেই অদ্ভুত অসার্থক প্রণয়ের জ্বালাময় অভিজ্ঞতা এবং উত্তরজীবনে তারই ছায়ায় রচিত নতুন যৌনজীবনদর্শন (যার সার্থকতম প্রকাশ 'লেডি চ্যাটার্লি'-র পূর্ণাঙ্গ শেষ ভাষ্যে এবং সেই কবিতাস্বরূপ ছোট গল্প 'শেষ হাসি'তে) লরেন্‌স্‌-এর কবিতার প্রত্যয়-ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই যৌনজীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এট্রুরিয়া ও মেক্সিকোর জীবনধারার বাণী। মানুষের মধ্যে যা কিছু প্রকৃতিজ, তার পূর্ণ অবারিত প্রকাশ আদিম সমাজের আন্তর চেতনা—সেই চেতনা লরেন্‌স্‌-এর কবিতার প্রাণস্বরূপ :

"পাপ ? কোথায় পাপ ?
পাপ তো একমাত্র জানি, জীবনকে অস্বীকার করা।
একদা রোম এট্রুরিয়াকে অস্বীকার ক'রেছিল,
আর আজও যন্ত্ররাজ আমেরিকা মণ্টেজুমাকে।" (লরেন্‌স্‌ থেকে)

ইওরোপীয় কাব্যলোকের ক্ষেত্রেও লর্‌কা-র নতুন প্রতিষ্ঠাও এই একই কারণ প্রসূত। আন্দালুজিয়া-র লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমি তাঁর কবিতার

অতলান্ত ব্যঞ্জনার উৎস। ইগনাসিও লান্তো বিলাপের সেই পুনরুক্ত 'বিকেল পাঁচটায়' মধ্যযুগের রোম্যান্‌স্ ও বালাদের স্মৃতির অনুষঙ্গেই অমন তীব্র বেদনায় ভারাবনত হয়।

"বিকেল পাঁচটায় তার শয্যা চার চাকার উপর কফিন।
বিকেল পাঁচটায় হাড়ে আর বাঁশীতে তার কানে সুর বাজায়।
বিকেল পাঁচটায় তার কপালে খেপা ষাঁড় গর্জন করে।
বিকেল পাঁচটায় ঘরটা বেদনার আগুনে চ'মকে ওঠে।
বিকেল পাঁচটায় দূর থেকে গ্যাংগ্রীন হানা দিয়ে আসে।
বিকেল পাঁচটায় সবুজ জংঘায় লিলি-ট্রাম্পেট ডেকে ওঠে।
বিকেল পাঁচটায় আঘাতের ক্ষতগুলো সূর্যের মত পোড়ে।
বিকেল পাঁচটায় জনতা জানলা ভাঙে।
বিকেল পাঁচটায়।
উঃ, সেই ভয়ঙ্কর বিকেল পাঁচটায়।
সবকটা ঘড়িতেই তখন পাঁচটা।
তখন বিকেল পাঁচটার ছায়া।" [লর্‌কা থেকে]

নিজের দেশের মানুষের সমগ্র জীবনধারায় প্রাণময় চেতনাকে জীবনবেদে রূপান্তরিত করে য়েটস্ ও লর্‌কা কাব্যের আকাশে মুক্তি পেয়েছেন। এট্রুরিয়া ও মেক্সিকোর আদিম জনজীবনের ধারায় লরেন্‌স্ তাঁর জীবনচিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এলিয়ট ও তাঁর উত্তরসূরীরা ওখানেই হার মেনে গেছেন। পুরনো সাহিত্যই হোক, আর ফ্রয়েড-মার্কসের সেই অপরূপ রাসায়নিক মিশ্রণই হোক, সেই বন্ধ্যা ভূমিতে আগাছারই চাষ চলে, মাঝে মাঝে বড় জোড় ক্ষীণজীবী বনস্পতি। অ্যাংলো-ক্যাথলিসিজম্-এর ছায়ায় এলিয়ট অপেক্ষাকৃত সফল কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ফেবার অ্যাণ্ড ফেবারের ধুরন্ধর ডিরেক্টরের বিশ্বাসের জোর কতখানি, সে প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? নিতান্তই বুদ্ধি দিয়ে কোনো এক ধর্মকে গ্রহণ করে তাকে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলে, সে ধর্ম ক্ষয়রোগের শিকার হয়। আর তাই কি 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্'-এর সার্থকতার পরই এলিয়টের কাব্যলীলা স্তব্ধ হয়ে গেল? ১৯৫৪-এর 'কাল্টিভেশন অফ ক্রিস্‌মাস্ ট্রীজ' তো নিতান্তই প্রতিধ্বনি, ততোধিক কিছু নয়। অডেন্-এর শিষ্যপ্রতিম লরেন্‌স্ ডারেল যাই বলুন না কেন, অডেন্ ও স্পেণ্ডারের ইদানীন্তন পর্বের কবিতায় স্থায়িত্বের আশ্বাস দেখি না। নতুন কাব্যসংগ্রহে পুরনো কবিতার মতবাদ ও বক্তব্য বদলাতে গিয়ে অডেন্ যে ভাষ্যান্তর সৃষ্টি করেছেন, তাতে পুরনো কবিতার কাব্যমূল্য বিপর্যস্ত হয়েছে, কবিতার রূপ

বারে বারে ভেঙে গেছে। 'গ্রীষ্ম রাত্রি' (১৯৩৩) কবিতায় নতুন সমাজবাদী সংস্কৃতির গুণকীর্তন শেষ করে অডেন্ লিখেছিলেন:

"এর জন্যে যদি নিজের একাকীত্বকে হারাবার ভয়ও থাকে,
তবু এর যেন কৈফিয়ৎ না লাগে।"

অস্যার্থঃ, নতুন সমাজবাদী সংস্কৃতিতে আমাদের একাকীত্ব ভেঙে গেলে তাকে মঙ্গল বলেই মানব। নতুন ভাষ্যে সমাজবাদী সংস্কৃতির প্রশংসাসূচক এবং পলায়নী মনোবৃত্তির নিন্দাস্বরূপ স্তবকগুলি বর্জন করে অডেন্ লিখেছেন:

"এই যে কত সুখ, ভয় পাই হারাবো ব'লে,
এই যে একাকীত্ব, এদের যেন কৈফিয়ৎ না লাগে।"

অর্থাৎ, পুরনো সংস্কৃতির সুখরাশি ও একাকীত্বের পলায়নী বৃত্তি, অডেন আজ উভয়কেই মঙ্গল বলে মানেন। মতবাদ বদলে গেছে বলে পুরনো কবিতার বিকৃতি ঘটানোর এই 'ব্লাস্‌ফেমি', এ বোধহয়, এ-কালেই সম্ভব।

এ-হেন কালে আধুনিক ইংরেজি কবিতার ইতিহাস ও কাব্য সমুদ্রে অবগাহন করে সুখ আছে। আর সুকবি ও উপন্যাসকার লরেন্‌স্ ডারেল সহায় হলে তো কথাই নেই! ইংরেজি কাব্যের বিচারের বিধি ইংরেজ কবিকুলই কালে কালে বেঁধে দিয়েছেন। এ-যুগেও তার ব্যতিক্রম নেই। সিডনী, ড্রাইডেন, পোপ, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ, কোল্‌রিজ, শেলী, কীটস্ আর্নল্ড, হপকিন্‌স্-(পত্রগুচ্ছে)-এর ধারা য়েটস, এলিয়ট, স্পেণ্ডার, ডে লিউইস, ম্যাক্‌নীস, রয় ফুলার ও লরেন্‌স ডারেল-এর কীর্তির মধ্যে অব্যাহত। এঁরা কেউই সন-তারিখের গতানুগতিক সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন নি। স্বকীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করে তারই আলোকে এঁরা স্বকালের কবিতার মূল্যবিচার করেছেন। আর সেই কারণেই পছন্দ-অপছন্দ শত্রু-মিত্রের প্রশ্ন এঁদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে নি। গুরুত্বের তারতম্যবিচারে জনপ্রিয় খ্যাতিমানদের নাম সময়ে সময়ে বাদ দিতেও এঁদের দ্বিধা নেই। সৎসাহস, উদার নির্মোহ, গভীর দৃষ্টির সমপ্রয়োগে কোনো বাঙালী কবি আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস রচনায় হাত দেবেন কি? ইংরেজ কবিদের অনেকেই তো প্রয়াসে মান রেখে গেলেন।

পরিশেষে, একটি কথা। প্রকাশন সৌকর্যে রূপার তো সুনাম আছে। তবু এবার এত মুদ্রণপ্রমাদ কেন? অন্তত পঞ্চান্নটি ছাপার ভুল চোখে পড়েছে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পু স্ত ক   প রি চ য়

ফাউস্ত, প্রথম ভাগ। যোহান ভোল্‌ফগাঙ্ গ্যোতে। মূল জার্মান থেকে কানাইলাল গাঙ্গুলী কর্তৃক অনূদিত। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স। ছয় টাকা।

ফাউস্ত জার্মান কাব্য সাহিত্যের কৌস্তুভমণি, বিশ্বকাব্যসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। ইহার রচয়িতার জীবনালেখ্য, ভাবিতে আনন্দ লাগে ইতিপূর্বেই বাঙালীর চিন্তাজগতে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে। বাংলাদেশের বাহিরে না গিয়া ও জার্মান ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবেও ওদুদ সাহেব গ্যেটে-অনুরক্তির যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। সেই সঙ্গে একথাও না মানিয়া উপায় নাই যে গ্যেটের কবিপ্রতিভার সম্যক রসাস্বাদনের জন্য জার্মান ভাষার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় অপরিহার্য। কোন অনুবাদই তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না।

তবে কি বলিতে হইবে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় কাব্যের অনুবাদ একান্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টা? মোটেই না। বরং বলা যায়, কোন এক ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা সেই ভাষার কাব্যসৃষ্টি দিয়া যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনই প্রমাণিত হইতে পারে অন্য ভাষার কাব্যসৃষ্টিকে আপন করিয়া লইবার প্রয়াসের মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ, ইহারা জাতির কাব্যপিপাসা মিটাইবার বিভিন্ন পন্থা মাত্র। যে জাতির আপন সাহিত্য যত উন্নত, অন্য ভাষার কাব্য-সাহিত্যকে স্বীকরণের সামর্থ্য তার তত বেশি। এই স্বীকরণের উদ্দেশ্য নয়, অন্য ভাষার কাব্যসম্পদকে মূল ভাষায় জানিবার আগ্রহকে অনাবশ্যক করিয়া তোলা, স্বীয় শক্তির প্রয়োগে অন্য ভাষার কাব্যসম্পদের সমীপবর্তী হওয়াই যথেষ্ট প্রয়াস-যোগ্য আদর্শ।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গৌরবে বাঙালী মাত্রেই আত্মতৃপ্ত। কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্য ভাষা হইতে কাব্যানুবাদে যথেষ্ট তৃপ্তি পাইবার সঙ্গত কারণ আমাদের আছে কি? ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে বাংলা অনুবাদের আগ্রহ আমাদের নাই এই অহংকৃত বিশ্বাসে, যে তাহাতে এমন কিছু নাই

যাহা বাঙালীর পক্ষে অনুবাদের যোগ্য। সংস্কৃত কাব্যের নিয়মিত বিধিবদ্ধ অনুবাদের প্রয়োজন আমরা দেখি না, যেহেতু আমরা ধরিয়া লই সংস্কৃত কাব্যের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় বাঙালী লেখক ও পাঠকদের আছে। এ বিশ্বাসও কতখানি ঘাতসহ, বলা কঠিন। বাংলা ভাষার বাহিরে অন্য যে কোন ভাষার সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের জন্য আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল ইংরেজি ভাষার ওপর। প্রাচীন গ্রীক-লাতিনই হোক বা আধুনিক জার্মান রুশই হোক, ইংরেজিতে অনুবাদ না থাকিলে আমরা অন্ধ ও মূক, আমরা চোখে দেখিতে পাই না, আমাদের মুখে কথা ফোটে না। ইংরেজি-কাব্যের বিশ্ব-গৌরবের কথা আমরা জানি। কিন্তু, তাহার বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন-বোধ আমাদের নাই। যে বাঙালী ইংরেজি জানে না, সে কি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত? আর অন্যভাষা হইতে অনুবাদ যদি ইংরেজিতেই পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য ভাষা শিখিবার কষ্ট স্বীকারের অনুপ্রেরণা আসিবে কোথা হইতে।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর এই মানসিক পরিস্থিতিতে শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলীর বর্তমান প্রয়াসকে অভিনন্দন মনে জাগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ফাউস্ত-এর অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি ইংরেজি অনুবাদের মোহে আবিষ্ট হন নাই। 'ভূমিকা'-য় তিনি লিখিতেছেন:

"জীবনের বিভিন্ন সময়ে জার্মেনীতে বাস করে জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের উপর "ফাউস্তে"-র যে কী প্রভাব তা প্রত্যক্ষ করেছি। "ফাউস্ত" জার্মান জাতির শুধু গর্বের বস্তু নয়, প্রাণের বস্তু। এর অর্থ ও রস বিভিন্ন শ্রেণীর লোক কি ভাবে গ্রহণ করে তারও অনুভূতি আমার অনেকটা হয়েছে। আর একাধিকবার জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ নট ও নটী কর্তৃক অভিনীত ফাউস্ত প্রথম ভাগের অপূর্ব অভিনয় রঙ্গমঞ্চে দেখে কেবলই ইচ্ছা হত এই অপূর্ব সাহিত্য আমার মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে বাঙালীর হাতে তুলে দেই, তাই এ চেষ্টা।"

বহু বৎসরের সাভিনিবেশ পরিশ্রমের পর কানাইবাবু প্রকাশ করিয়াছেন এই অনুবাদ-গ্রন্থ। "আমি সব চেয়ে বেশী চেষ্টা করেছি মূল জার্মান ফাউস্তের প্রত্যেকটি অংশের অবিকল ভাব সরল ও রসযুক্ত করে প্রকাশ করতে, অবশ্য খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে। তবে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক স্থলে অধিক কথার ব্যবহার করতে হয়েছে, অনেক স্থলে আবার অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ভাব অবিকৃত রেখেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হল উচ্চশ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।"

এইভাবে ফাউস্ত-অনুবাদের যে দুরূহ সাধনায় কানাইবাবু প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সিদ্ধির জন্য কেবল জার্মান ভাষাতে দক্ষতা যথেষ্ট নয়, আপন মাতৃভাষার মাধ্যমেও তাঁহার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে ফাউস্ত প্রথম ভাগের কয়েকটি ছিন্নাংশের ছন্দানুবাদ আছে শেলীর করা। তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে 'স্বর্গে প্রোলোগ' যাহাতে তিনজন প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের স্তুতি গাইতেছেন। শেলী এই অংশের একটি লাইন-অনুযায়ী গদ্যানুবাদ করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন: "Such is a literal translation of this astonishing chorus; it is impossible to represent in another language the melody of the versification; even the volatile strength and delicacy of the ideas escape in the crucible of translation, and the reader is surprised to find a *caput mortuum.* এই "মৃতদেহে" প্রাণ সঞ্চারের জন্য শেলী ইহাকে ছন্দোবদ্ধ রূপও দিয়াছিলেন। অনেক আলোচকের মতে, অনুবাদে মূলের যতখানি সমীপবর্তী হওয়া সম্ভব, শেলীর অনুবাদে তাহা হইয়াছিল। এবং পরম পরিতাপের বিষয় যে এই অনুবাদ সম্পূর্ণ না করিয়াই শেলীর জীবনাবসান হয়। বাংলাদেশে জার্মান ভাষায় কানাইবাবুর মতো পণ্ডিত পাঠকের সংখ্যা অতি বিরল। তাই শেলীর অনুবাদের একটি স্তবক এখানে ইংরেজিতে দেওয়া যাইতেছে।

Raphael : "The sun makes music as of old
Amid the rival spheres of Heaven,
On its predestined circle rolled
With thunder speed : the Angels even
Draw strength from glazing on its glance,
Though none its meaning fathom may.—
The world's unwithered countenance
Is bright as at Creation's day."

শেলীর অনুবাদে মূলের ছন্দ-ঝঙ্কার ও ভাবঘনত্ব যতটা প্রকাশ পাইয়াছে কানাইবাবু তাঁহার বাংলা অনুবাদে তাহার কতটা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন তাহা দেখা যাক।

রাফাএল : "তারার সভায় আগেরি মতন,
গানের দ্বন্দ্বে গাহিছে তপন
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ।
দেখি এ দৃশ্য দেবদূতগণ
হয় বলীয়ান,
না বুঝেও এর নিগূঢ় কারণ
অতি মহীয়ান।
চিন্তার পার তোমার সৃজন,
যা ছিল আদিতে রয়েছে তেমন
অতি গরীয়ান।"

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই অনুবাদে গদ্যের বদলে ছন্দ ব্যবহার করিয়াও কানাইবাবু, শেলীর ভাষায়, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন কি? তাহা ছাড়া, মূলে আছে, যাহা শেলীর অনুবাদেও আছে, যে রাফাএল, গাব্রিএল ও মিখাইল, ইহাদের প্রত্যেকের উক্তি একই পর্যায়ের মিল-গ্রন্থনে স্তবকবদ্ধ। কিন্তু কানাইবাবুর অনুবাদে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

ফাউস্ত-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সম্পূর্ণ অনুবাদের বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা ইংরেজি ভাষায় যে কয়েকজন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেয়ার্ড টেলর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদক হিসাবে তাঁহার দাবি এই যে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের ভাষা ও ছন্দ এতই সঙ্গতিপন্ন যে ফাউস্ত-এর মতো কঠিন কাব্যকেও ভাবে ভাষায় ছন্দে অবিকলভাবে ও আক্ষরিকভাবে প্রতিবিম্বিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন—অনমনীয় প্রয়াস, যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ফাউস্ত-এর পঞ্চদশ দৃশ্য—যে দৃশ্য গ্যোতে পাঠকদের নিকট একবার পড়ার পরই থাকিয়া যায় অবিস্মরণীয়। এই দৃশ্যে আর কিছুই নাই—আছে মাত্র একটি গান, গাহিতেছেন মার্গারেত একাকিনী, চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে, ফাউস্ত-এর বিচ্ছেদে বিহ্বল অবস্থায়।

"My peace is gone
My heart is sore;

I never shall find it,
Ah, nevermore !

Save I have him near,
The grave is here ;
The world is gall
And bitterness all.

My poor weak head
Is racked and crazed ;
My thought is lost,
My senses mazed,

My peace is gone,
My heart is sore ;
I never shall find it
Ah, nevermore.

To see him, him only,
At the pane I sit ;
To meet him, him only,
The house I quit.

His lofty gait,
His noble size,
The smile of his mouth,
The power of his eyes,

And the magic flow
Of his talk, the bliss
In the clasp of his hand,
And ah ! the kiss !

My peace is gone,
My heart is sore,
I never shall find it
Ah, nevermore !

My bosom yearns
For him alone ;
Ah, dared I clash him
And hold, and own,

And kiss his mouth,
To heart's desire,
And on his kisses
At last expire !"

কানাইবাবুর অনুবাদ :

"শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হোল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো
ফিরবে না তো আর !
যেথায় সে নাই সবই সেথা
কবর মনে হয়,
সর্বজগৎ সেথায় যেন
তিক্ত হয়ে রয় ।"

(পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, এই স্তবকের মিল-গ্রন্থন, যাহা বেয়ার্ড টেলর বজায় রাখিয়াছেন, তাহা বাংলা অনুবাদে লঙ্ঘিত হইয়াছে)

"বেদনকাতর আমার মন
পাগল হল প্রায়,
উদাস মনের ভাবনাগুলি
টুকরো হয়ে যায় ।

শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার ;
শান্তি আমার ফিরবে না তো,
ফিরবে না তো আর।
বাইরে তাকাই জানলা দিয়ে
দেখব তাকে তাই
তাহার মিলন পাবার তরে
ঘরকে ছেড়ে যাই।
তাহার চলন কী যে শোভন,
সুঠাম দেহ তার,
মুখের মধুর মৃদুল হাসি
মোহন দিঠি আর,
সুধার মতন কথার যাদু
কতই বা না খেলে
পুলক হাতের পরশ পেলে
হরষ চুমা খেলে !
শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার
শান্তি আমার ফিরবে না তো
ফিরবে না তো আর !
হৃদয় আমার তাহারে চায়
তাহার পানে ধায়
হায় রে তাকে পেতাম যদি
ধরতে এ হিয়ায়,
পারতেম দিতে তাকেই চুমা
যেমন হৃদি চায়,
ডুবিয়ে দিতাম চুমাতে তার
জীবন চেতনায়।"

অকপটে স্বীকার করিতেছি কানাইবাবুর অনুবাদ পড়িয়া বহুকাল পরে মূল জার্মানে এই কবিতাটি পড়িবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। পরে তাহাকে

নূতন করিয়া অনুবাদের লোভকে সংবরণ করা হইয়া উঠিল অদম্য। এই অনবদ্য কবিতাটির একাধিক অনুবাদে দোষ নাই, এই ভরসায় আমার অনুবাদটিও এখানে তুলিয়া দিতেছি। আশা করি, পাঠকেরা অপরাধ লইবেন না।

শান্তি আমায় ছেড়ে গেছে,
মন হয়েছে ভার,
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

নাই যেথা পাই তারি খবর
আমার কাছে তা যে কবর
সারা জগৎ তার বিহনে
তিক্ত-কষায় আমার মনে।

আমার পোড়া মাথা যেন
ফেটে হয় চৌচির,
আমার পোড়া বুকটা যেন
রয় না কভু স্থির।

শান্তি আমায় ছেড়ে গেছে
মন হয়েছে ভার
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

শুধু তারেই দেখার তরে
থাকি জানালায়,
তারি কাছে যাবার তরে
পথে পা বাড়াই।

তার দৃপ্ত চলার ভঙ্গী
বীরের মতো কায়া,
ঠোঁটের মিষ্ট হাসিটি তার
চোখের মোহন মায়া।

যাদুভরা স্রোতের মতো
তারি মুখের বচন,
শিহর-ভরা হাতের চাপন,
আঃ, তার চুম্বন !

শান্তি আমায় ছেড়ে গেছে
মন হয়েছে ভার
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর !

আমার বুক যে ছুটে চলে
কেবল তারি টানে,
যদি তাকে ধরতে পেতাম,
টানতে আমার পানে,

মুখেতে তার চুমো খেতে
যত আমার সাধ,
জ্ঞান হারাতাম তারি চুমার
পেতে পেতে স্বাদ !

কানাইবাবুর এই অনুবাদ সমগ্রভাবে মূল জার্মানের সহিত মিলাইয়া পড়িবার যোগ্যতা আমার নাই, অবসরেরও অভাব। দক্ষতর ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া অবশ্যকর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, আমি একান্ত মনে বিশ্বাস করি, যাহা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় :

"ফাউস্ত-এর প্রথম খণ্ডের এই বাংলা অনুবাদের প্রকাশন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, তথা জার্মানি ও ভারতের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ইতিহাসে, একটি স্মরণীয় ঘটনা রূপে পরিগণিত হইবে।"

নীরেন্দ্রনাথ রায়

Tagore and Man. Tagore Centenary Peace Festival, All India Committee, Calcutta. Rs. 2·50.

In Homage To Tagore. T C P F, A. I Committee, Calcutta. Rs. 3·50

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার, বুঝবার ও মূল্যায়িত করবার চেষ্টা হয়েছে ; হয়তো আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, হয়তো বা এই প্রচেষ্টার অনেকখানি আমাদের পৌত্তলিক ও গুরুবাদী ঐতিহ্য অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র দুই দশকের। মহাপ্রতিভাধর শিল্পী বা মনীষীর তিরোধানের পর কিছুকাল উচ্ছ্বাসময় শ্রদ্ধাঞ্জলিদানোৎসাহ অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্র তিরোধানের পরবর্তী দুটি দশক তাই শ্রদ্ধাঞ্জলির "বিশেষণে সবিশেষ"। শেক্স্পীয়রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ছিল প্রথম মুদ্রিত শেক্স্পীয়রের সম্পূর্ণ রচনাবলী (প্রথম ফোলিও)। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ শেক্স্পীয়র অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর সব কটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে, যদিও রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। বেন জনসন শেক্স্পীয়রের প্রথম ফোলিওর প্রারম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "শেক্স্পীয়র কোনো বিশেষ যুগের নন, তিনি সর্বকালের।" রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তি উৎসব কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার অংশবিশেষের অনুবাদ এবং সেই অনুবাদসংগ্রহের সহগ ও পরিপূরক হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামক গ্রন্থটির পরিবেশন অত্যন্ত কালোপযোগী হয়েছে। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থটির মধ্যে যে কথাটি বিশেষ-ভাবে উচ্চারিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ দেশবিশেষের নন, তিনি সর্বদেশের। বেন জনসনের উক্তি যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলির বিনয়ে মণ্ডিত হলেও অর্থবহ, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে নানাদেশের খ্যাতনামা শিল্পী ও মনীষীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তেমনি অনুষ্ঠান-সম্মত হয়েও অর্থগূঢ়।

একালের আঠারো জন বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের যে সর্বদেশীয়তা ও সর্বজনীনতার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন, তাঁর যে আন্তর্দেশিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংবেদনশীল মানবতাবোধের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তার সহস্র সহস্র উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কপিরাইটের বিধিনিষেধের জন্য এই গ্রন্থের

উদ্যোক্তারা আপাতত ক্ষীণকায় অনুবাদসংগ্রহেই নিজেদের উদ্যোগ সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবু এই সংগ্রহের মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই অনুভবোজ্জ্বল, সাহসবিস্তৃত বিরাট মনোভূমির পরিচয় পাই যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির।" রবীন্দ্রমানসের সেই মহাদেশোপম আয়তক্ষেত্র সত্যই বহুজাতির বহু শ্রেষ্ঠ ভাবধারার বিচিত্র সঙ্গম।

'মানুষ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি মূলত আন্তর্জাতিক পাঠকদের জন্য সঙ্কলিত। কিন্তু ভারতীয়দের কাছেও এই গ্রন্থের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রবীন্দ্র-দর্পণে যেমন জাতিকে দেখা যায়, তেমনি জাতির দর্পণেও রবীন্দ্রনাথকে দেখা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু যখন আমাদের সঙ্কীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে রবীন্দ্র-নাথকে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হই তখন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমরা অবিচারও করে বসি। আমাদের একদেশদর্শিতা নানা ভ্রান্তির উৎস হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেশী না বিদেশী, খাঁটি না ভেজাল এসব তর্কের মীমাংসাও শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে আমরা নিজেরাই কতখানি দেশী বা বিদেশী, খাঁটি বা ভেজাল তার উপর। চিরকালের কথা জানি না, কিন্তু এখনও বহুকাল রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় থাকবেন এবং সেই কারণে রবীন্দ্র-মনস্কতারও প্রয়োজন থাকবে। ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় যেমন শেক্স্পীয়রে, ভারতবর্ষেরও শ্রেষ্ঠ পরিচয় তেমনি রবীন্দ্রনাথে। আমাদের গর্ব এই যে সেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উদার মানবিকতা ও শান্তিকামী আন্তর্জাতিকতারও প্রবক্তা। রবীন্দ্রতর্পণ আমাদের সংস্কৃতিকৃত্যের এক আবশ্যিক অঙ্গ; আর রবীন্দ্রোচ্ছ্বাস আমাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস বিগত দুই দশকে 'মহাকবি' 'ঋষি', 'বিশ্বকবি' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত কয়েকটি সুগম অথচ অস্পষ্ট বিশেষণের মধ্যেই অর্গলিত থেকেছে। কখনও বা এই পরম নিশ্চিন্তির বিপরীত প্রান্তে চমকপ্রদ রবীন্দ্র-দূষণ প্রয়োগে আমরা বাহবা কুড়াতে প্রয়াসী হয়েছি। ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর হয়তো নানা পরিবর্তন ঘটবে, ঘটা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সে পরিবর্তন আমাদেরই নানা পালাবদলের সূচক হবে, কোনো পণ্ডিতম্মন্যতা বা মূঢ় আত্মম্ভরিতা থেকে উৎসারিত হবে না। ভাবীকালের সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করতে পারবেন না, নূতনভাবে ব্যাখ্যা করবেন মাত্র।

নূতনকালসম্মত সেই রবীন্দ্রনাথকেও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই প্রমাণিত করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে আমরা যে আত্মপরিচয় লাভ করি এবং করব তার মূল্য সহজে হ্রাস পাবার নয়। অনেক সময় ঘর থেকে দেখা এবং বাইরে থেকে দেখা এই দুটিকে একত্র না মেলালে দেখাটা খণ্ডিত থেকে যায়। সেইজন্য বিদেশীর চোখের রবীন্দ্রনাথকে দেখারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থটি ঘর থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথকে বাইরে থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমরা', 'চিত্রশিল্পীর দর্শন', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুলিখিত এবং মননশীলতায় ভাস্বর। মানুষের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস, শান্তি ও মৈত্রীতে অবিচলিত আস্থা রবীন্দ্রচরিত্রের অপরূপ বৈশিষ্ট্য। বিদেশী লেখক ও মনীষীবৃন্দ মূলত এই বৈশিষ্ট্যকেই তাঁদের শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় অবশ্যই আরও ব্যাপক, কিন্তু বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এখনও স্বল্প ও দুর্লভ বলে রবীন্দ্রনাথের নানা দিক বিশ্বের কাছে অনেকখানি অপরিজ্ঞাত। শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তি উৎসব কমিটির এই অনুবাদ-প্রচেষ্টা এই কারণে বিশেষ প্রশংসার্হ।

সরোজ আচার্য

সুন্দরবন। শিবশঙ্কর মিত্র। কথাশিল্প। সাড়ে তিন টাকা।

শিবশঙ্কর মিত্রের প্রথম বইটির নাম ছিল 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার', এবারে শুধু 'সুন্দরবন'। এই বইয়ে সুন্দরবনের অতি সাধারণ ও অতি দুর্ধর্ষ জনকুড়ি মানুষকে নয়টি গল্পের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। এই মানুষগুলো যতক্ষণ তাদের জীবিকানির্বাহের পরিবৃত্তে, ততক্ষণ শোষণে ও বঞ্চনায় এবং দরিদ্রতম উপকরণের সাহায্যে জীবনধারণের দুরূহতম প্রচেষ্টায় তাঁরা বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু যেহেতু মানুষগুলো সুন্দরবনের, অতএব জীবিকার তাগিদেই তাদের সুন্দরবনের গহনে যাতায়াত। এই সূত্রেই সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গেও তাদের পরিচয়। আর বাঘ ও মানুষের সাক্ষাৎকার কোনো ক্ষেত্রেই সৌজন্যমূলক হবার নয়। সেক্ষেত্রে হয় বাঘকে কিংবা

মানুষকে প্রাণ দিতেই হয়। 'সুন্দরবন' এই প্রাণ-হননেরই গল্প। কিন্তু শুধু যদি তাই হতো তাহলে মামুলী শিকার-কাহিনীর বেশি মর্যাদা এই বইয়ের প্রাপ্য ছিল না। সুন্দরবনের জীবন ও সুন্দরবনের ভূ-দৃশ্য আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যেকটি গল্পে সন্নিবেশিত। এবং লেখকের পক্ষে সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা এই যে এই জীবন ও ভূ-দৃশ্যের বর্ণনায় এই নয়টি গল্পে কোথাও পুনরুক্তি ঘটেনি। এই কারণেই নয়টি পৃথক গল্প যেন একটি উপন্যাসেরই নয়টি অধ্যায় হয়ে উঠেছে। আর সুন্দরবনের সবচেয়ে হিংস্র ও সবচেয়ে সুন্দর যে জীব, সেই বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার-ই যেন এই উপন্যাসের নায়ক। ছোট-বড় সকলেরই এই বইটি ভালো লাগবে। সুন্দরবনের এমন নিবিড় ও অন্তরঙ্গ ছবি বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয়। আর এমন রুদ্ধশ্বাস গল্পের আস্বাদ পাওয়াটাও বিরল এক অভিজ্ঞতা।

তবে এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পেই একটি কি দুটি মৃত্যুর ঘটনা এসেছে। এতগুলো মৃত্যু ঠিক যেন সহ্য করা যায় না। 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার-এ কিন্তু এই বুকচাপা বিষণ্ণতা ছিল না। বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের এতগুলো মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের এমন মর্মভেদী কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের সামনে উপস্থিত করা সঙ্গত কিনা লেখক ভেবে দেখবেন।

অমল দাশগুপ্ত

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

গত ফাল্গুন ১৩৬৮ সংখ্যায় শ্রীগোপাল হালদার কয়েকটি উক্তি করেছেন তারই সম্পর্কে এই চিঠি। অনুগ্রহপূর্বক চিঠিটি আপনাদের আগামী সংখ্যায় ছাপালে বাধিত হবো।

১। শ্রীগোপাল হালদার বলেছেন,—'শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথা তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন।'

যে-কেউ আমার বিশ বছরের ইতিহাস জানেন তাঁদের পক্ষে এ ভুল অস্বাভাবিক। আমি আমার কিশোর বয়স থেকেই থিয়েটার ভালোবেসেছি, এবং যা কিছু করেছি সব থিয়েটারের জন্যই করেছি।

২। আমি কোনও নির্বাচনী প্রচারকার্য্য করতে যাই নি। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম একটি সাংস্কৃতিক সভায় যাওয়ার জন্য। এর বেশী কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না, কারণ—

৩। যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায়, এবং যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমার ভালো বলেই মনে হোত, তাতে কী হোত? গোপালদার পক্ষে গেলেই কি আমি মহৎ শিল্পী হতাম? আর না গেলেই কি আমার সংস্কৃতি বিকৃত? মহৎ শিল্পী হবার পথ তো তাহলে বড়ো সোজাই হোত! এবং গোপালদা যদি ভবিষ্যতে কোনওদিন মন্ত্রী হন তাহলে তখন তাঁকে সমর্থন করায় মন্ত্রীনীতি হবে না তো? ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের মৌলিক অধিকার আছে যে-কোনও প্রার্থীকে সমর্থন করার। সেইটাই ডিমোক্র্যাসীর অধিকার। এবং সেইজন্য যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায় তাহলেও কোনও দৈনিক বা মাসিক পত্রিকার পক্ষে অশালীন হবার কোনও যুক্তি ঘটে না।

৪। গোপালদা ঠিক লিখেছেন, আমি কুড়ি বছর থেকে খালি ফেলই দেখছি।

(ক) প্রথম ফেল গোপালদাদের গণনাট্যসংঘ। যেখানে কাজ করতে পারলাম না। খালি আমি নয়, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যও।

(খ) দ্বিতীয় ফেল, বহুরূপী সংগঠন থেকে 'পথিক' ক'রে, 'চার অধ্যায়'

ক'রে, 'দশচক্র' ক'রে গোপালদার দলভুক্ত প্রগতিবাদীদের কাছে প্রত্যেকবার প্রভূত গালাগালি খেয়েছি।

(গ) তৃতীয় ফেল, আমাদের 'রক্তকরবী' অভিনয় নিয়ে যখন সমাজের একটা অংশে অত্যন্ত উত্তেজনা, এবং আমাদের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেবার জন্য যখন অনেক চেষ্টা চলেছে তখন গোপালদার দলীয় দৈনিক কাগজ একটি কথাও আমাদের পক্ষে বলে নি। অথচ অত্যন্ত সম্প্রতি আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদপূর্ণ চিঠি ছাপাতে পেরেছে যে আমি নাকি 'বিসর্জন' অভিনয়ে আমার নিজের লেখা সংযোজনা করেছি। আনন্দবাজারেরও আগে স্বাধীনতা কাগজ এই শুভকর্মের সূচনা করে।

(ঘ) এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে বড়ো ফেল হচ্ছেন গোপালদা নিজে। তাঁর নিজের কাগজে—পরিচয়ে—এরই আগের সংখ্যায় আমাদের সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করা হয়েছিল[১] সেটার তিনি কিছু করতে পারলেন না, পারলেন কেবল রাস্তার রকের ছেলেদের মতো দায়িত্বহীন টিপ্পনি কাটতে?

অথচ কেন? আমি যদি বাজে লোকই হই তাহ'লে আর আমাকে এতো খোঁচাখুঁচি কেন? কুড়ি বছর তো অনেক বছর, এবার শীগগিরই তো শেষ

১। "আমাদের" বলতে শ্রীশম্ভু মিত্র কি বুঝিয়েছেন জানি না। তবে আগের সংখ্যায় 'বহুরূপী' সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই প্রকাশিত হয় নি। এমনকি তার আগের সংখ্যায়ও নয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'সংস্কৃতি-সংবাদ' বিভাগে 'নাট্যপ্রসঙ্গ' শিরোনামায় যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে প্রসঙ্গত লেখক 'বহুরূপী', শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের নাম উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেন, পাঠকদের সুবিধার্থে সেই অংশটুকু আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। এ মন্তব্যই সম্ভবত ওঁদের সম্পর্কে, কিন্তু তা 'বিদ্বেষপ্রসূত' কিনা পাঠকরা সে বিচার করবেন। প্রসঙ্গত জানানো দরকার বর্তমান চিঠিতে উল্লেখ ছাড়া সেই আলোচনার প্রতিবাদে অন্য কোনো পত্র বা আলোচনা আমরা এ-যাবৎ পাই নি।

"শুধু নাট্যপরিবেষণ নয়, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন তথা দর্শক রুচি গড়ে তোলার পেছনে লিটল থিয়েটার গ্রুপের এ জাতীয় প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমশই তাঁরা এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। এই দলটির কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। বাংলা দেশের গণনাট্য আন্দোলন ও সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এঁদের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ভূমিকাও স্মরণ করি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 'বহুরূপী' জীবিত থেকেও যেন নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তৃপ্তি মিত্র পেশাদারী নাটকে অভিনয় করে এবং 'বহুরূপী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণী ব্যক্তি একে একে দল ছেড়ে হয়তো এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। কচিৎ দু-একটি অভিনয়, তাও পুরনো নাটকের অভিনয় মারফৎ মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার হলে 'বহুরূপী' নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের আদর্শ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল আবেগে যখন দেশে এক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রমঅগ্রসরমান, তখন 'বহুরূপী'র প্রয়াসও সেই আন্দোলনের

হবে, আর কেন? আর যদি আমার মধ্যে কোনও পদার্থ থেকে থাকে তাহলে একটু জিজ্ঞাসা করা যেত, একটু আলোচনা ক'রে নেওয়া যেত, এবং এতদিন ধ'রে নির্বিচারে আমার সম্পর্কে যতো অশ্রদ্ধেয় উক্তি করা হয়েছে সেগুলোকে রোধ করাও যেত। তা না ক'রে এতো সহজে মানুষকে বিচার করা হয় কেন? অতি সরলীকৃত ফরমুলা দিয়ে মানুষকে বিচার করবার ঔদ্ধত্য থাকে অল্পবয়সীদের। গোপালদার বয়স কি তার চেয়ে বেশী হয় নি?

আরও আশ্চর্য রকম হাস্যকর মনে হয় যখন এইসব সুবাদে রবীন্দ্রনাথের নাম গদগদকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। কারণ মাত্র কয়েক বৎসর আগে পরিচয়ে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের নামে কী বলা হয়েছে আর কী হয় নি। আজ হাওয়া পাল্টেছে। কিন্তু তাই ব'লে আমার মতো সামান্য ব্যক্তিকে গালি দিতে গিয়ে অতো বড়ো নামটাকে টেনে আনবার কী দরকার? আমার ত্রুটির তো শেষ নেই, আমাকে এমনিই গালি দেওয়া যায়।

অনেক মোহ ভেঙে যাওয়ার দাম দিয়ে তবেই জীবনে জ্ঞানকে পেতে হয়। আমারও চারপাশে সেই রকম অজস্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নমূর্তি। তার মধ্যে গোপালদার মূর্তিও এমন ক'রে ভেঙে পড়বে এটা কেন যেন আশা করি নি। ইতি—

২৭।৩।৬২

শম্ভু মিত্র

পুনশ্চঃ—আশা করি, চিঠিটা সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গালাগালি দেবেন।

[শ্রীশম্ভু মিত্রের উপলব্ধির সম্পূর্ণ পরিচয় যাতে পাঠকবর্গ পেতে পারেন তার জন্য এই পত্র আমরা যথাযথ প্রকাশ করলাম। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—সম্পাদক।]

সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা সেই আশা রাখি। কারণ প্রথমাবধি যত সীমাবদ্ধতাই থাক, 'বহুরূপী' ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি এই আন্দোলনের সহযাত্রী হন তাহলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অনেক শক্তিশালী হবে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার এই সম্প্রদায় সম্প্রতি একটি নতুন নাটক, 'বিসর্জন', মঞ্চস্থ করেছেন। 'পরিচয়' 'বহুরূপী'র পুরনো বন্ধু। তাই 'বহুরূপী'র প্রতিটি উদ্যোগ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি। 'বিসর্জন' দেখার সুযোগ আমরা এখনও অর্জন করি নি। তাই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব হল না। আমরা ভরসা রাখি 'মুক্তধারা'র মতো এই নাটকটি 'কাঞ্চনরঙ্গ'র বন্যায় তলিয়ে যাবে না। বরং 'বিসর্জন' 'বহুরূপী'র জীবনে নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দেবে। বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রূপে এঁরা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলনকে, নিজেদেরও অগ্রসর করতে তৎপর হবেন।"

মাঘ সংখ্যা 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে 'কাঞ্চনরঙ্গ' গ্রন্থটির যে আলোচনা ছিল – শ্রীশম্ভু মিত্র নিশ্চয়ই সেটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন নি!

—সম্পাদক

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

সুনয়নী দেবীর জীবনাবসান হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির কন্যা সুনয়নী দেবী আবাল্য এক বিশেষ রুচি ও বৈদগ্ধ্যের পরিমণ্ডলে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর চিত্রশিল্পের প্রেরণা তৎকালীন বঙ্গদেশ, ঠাকুরপরিবার এবং আপন চিত্র-স্বভাবে নিহিত। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের সাহচর্য সত্ত্বেও সুনয়নী দেবীর অঙ্কন-শৈলীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যে ইতিহাসেরই এক অভিপ্রায় প্রকাশিত। শিল্প-সমালোচকদের চোখেও সেই স্বাতন্ত্র্য ধরা না পড়ে পারে নি। সুনয়নী দেবী অনেকটাই 'স্বভাব শিল্পী' ছিলেন। তদুপরি পূজা-পার্বণ-ব্রতকথার সহজাত আকর্ষণ ও অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পকর্মে লোকচিত্রের মোটিফ এনেছে। শিল্পগত তাবৎ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই একটি কারণে তিনি নমস্যা।

স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। জাগতিক নানা বিষয় ও ঘটনায় কৌতূহল এবং এক উদার-মানবিক-বিজ্ঞান-দৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিত্বে অনন্যতা এনেছিল। বিজ্ঞানের গবেষণায় সামাজিক ও মানবিক প্রয়োগে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন, রাজনীতিক মতামতে ছিলেন নির্ভীক প্রগতিবাদী। পার্কসার্কাস ময়দানে রবীন্দ্রমেলার আলোচনাচক্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা লক্ষ মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে। আকস্মিক এই বিয়োগ সংবাদে তাই আমাদের বিস্ময় ও বেদনার অন্ত নেই। তাঁর কাছে এখনো দেশের অনেক কিছু প্রত্যাশা ছিল!

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয় সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৬১ সালের আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত বাংলাদেশের এক অগ্রগণ্য পণ্ডিত ও গবেষকরূপে বহুপূর্বেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর 'অবস্কিওর রীলিজিয়স কাল্ট এ্যাজ ব্যাক-

গ্রাউণ্ড অব বেঙ্গলী লিটারেচার' গ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক অতি উল্লেখযোগ্য অবদান। তাছাড়া সাহিত্য ও সমালোচনা বিষয়ে তাঁর বহুবিধ গ্রন্থ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিরলস শ্রম ও মননশীলতার সাক্ষ্য। দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্য বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মতৈক্য না হলেও ডক্টর দাশগুপ্তের রচনা সর্বদাই আমাদের তথা দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মনোযোগ আকর্ষণ করে। দেখা যাচ্ছে সাহিত্য পুরস্কারও যোগ্য লোকে পায়, হয়তো এক-আধ সময়ে!

এক মধুর ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব দাশগুপ্ত মহাশয়কে নিছক এ্যাকাডেমিশিয়ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ভাববাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও ডক্টর দাশগুপ্তের বিশেষ মানসিকতা তাঁর সর্ববিধ গবেষণাকর্মে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে। এই উভয়বিধ গুণ তথা সরস অনুসন্ধিৎসা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত।

এরই প্রেরণায় মুখ্যত গবেষক ও প্রাবন্ধিক হওয়া সত্ত্বেও দাশগুপ্ত মহাশয় সৃজনধর্মী মৌলিক রচনা সৃষ্টিতেও অগ্রসর হয়েছেন। শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান আছে।

সর্বোপরি অধ্যাপক হিসেবে তাঁর সাফল্যের প্রমাণ দেশের অনেকানেক গুণীজনের বিবিধ সার্থকতায় প্রতিফলিত। আমরা আশা করব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ; যোগ্য শিক্ষণ ব্যবস্থা; শিক্ষার মাধ্যম ও সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির কর্মক্ষেত্রে বাংলাভাষার মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি তাঁর অধ্যাপকজীবনকালেই ঘটবে। এবং সেই দিনকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে দেশবাসীর সঙ্গে সর্বদাই তিনি একাত্ম থাকবেন। কারণ যে প্রেরণা ও মমতায় তাঁর সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক জীবন—তারই পরিণাম এই একান্ত আত্মীয়তা।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এই অসামান্য চলচ্চিত্রটি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়ের এক কীর্তি বিশেষ। ভারতবর্ষের ফীচার ফিল্মের ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' যে বিস্ময় নিয়ে এসেছিল, এতদ্দেশীয় ডক্যুমেণ্টারী ফিল্মের ক্ষেত্রেও 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রায় অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে। চিত্রনাট্য-পরিচালনা-সুরসৃষ্টি ও প্রয়োগ তথা সর্বক্ষেত্রে সত্যজিতের অপরিসীম কল্পনা, কুশলতা, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখেছি। ইংরেজি

সংস্করণে পরিচালকের স্বকণ্ঠে ধারাবিবরণী শোনার সুযোগও এক অভিজ্ঞতা। পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীর জীবনভিত্তিক তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধা নেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির ব্যবহার এবং আবহসঙ্গীতরূপে আদিম রণবাদ্যের মৃদু প্রক্ষেপণ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিল্পীর মর্মলোকের যে পরিচয় দেয়—তার তুলনা নেই। বইটিতে এই ধরনের অসামান্য অংশ যত্রতত্র আছে।

'ভগিনী নিবেদিতা' পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'তিনকন্যা'র অন্যতম 'সমাপ্তি' আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়েছে। 'তিনকন্যা'র তিনটি কাহিনীচিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'সমাপ্তি'ই দর্শনযোগ্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিনেতা জীবনের সাফল্য লাভ করেছেন এইখানে। অপর্ণা দাশগুপ্তের অভিনয়ও স্মরণীয়, যদিচ 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার আদলটি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। অবশ্য সেটি দোষেরই হোক, গুণেরই হোক—সে দায়িত্ব স্বয়ং পরিচালকের। কারণ 'সমাপ্তি'র অনেক অংশেই 'পথের পাঁচালী'র অবিস্মরণীয় স্মৃতি বারে বারে জেগে উঠেছে। 'তিনকন্যা' দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে সত্যজিৎ দর্শকের কাছে পৌছবার জন্য এক নতুন ভাষা খুঁজছেন—যা আপাতদৃষ্টিতে সরল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই ভাষা তো তাঁর অনায়ত্ত নয়! 'পথের পাঁচালী'র পরিচালক 'তিন কন্যা'য় কেন দ্বিধাগ্রস্ত ও 'পথসন্ধানী', এ-ও এক রহস্য। জনপ্রিয় রুচির কাছে তাঁর তুল্য ব্যক্তিত্ব ক্ষণেকের তরেও নতি স্বীকার করবেন—এ-কথা ভাবার দুঃসাহস নেই, অথচ 'সমাপ্তি'র মতো সুন্দর একটি ছবির শেষ এ-রকম একটি দরজা বন্ধ করা স্থূল দৃশ্যে কেন সমাপ্ত হলো—তারও অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। সত্যজিৎ আমাদের গৌরব, আমাদের আত্মীয়। দেশবাসী ও শিল্প-অনুরাগী হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের অপরিসীম প্রত্যাশা। পরবর্তী ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'অভিযান' সম্পর্কে তাই আমাদের অদম্য আগ্রহ। আশা করব নতুন বিষয় ও পরিবেশে তিনি এক নবতর সার্থকতার উদাহরণ বহন করে আনবেন।

সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছে আরও দুটি বাংলা ছবি—

'পুনশ্চ' ও 'সপ্তপদী'। বাংলাদেশে নব্য চলচ্চিত্রের আন্দোলনে মৃণাল সেন একটি অগ্রগণ্য নাম। প্রথমাবধি অন্যতম তাত্ত্বিক ও সংগঠকরূপে তিনি এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত—যে-প্রয়াস একশ্রেণীর দর্শক ও পরিচালক মহলে 'পথের পাঁচালী'র পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। তারপর পরিচালক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। 'নীল আকাশের নীচে' তাঁকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল, 'পুনশ্চ' দিল সম্মান। মৃণাল সেনকে তাই আমাদের অভিনন্দন। সত্যজিৎ রায় ও তিনি 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। তাই তাঁদের সম্মানে আমরাও গর্বিত।

পরন্তু, 'সপ্তপদী' সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর রচিত সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার প্রযোজিত, সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন অভিনীত একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র যা সর্বাধিক সম্মান রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ না করায় আমরা সর্বাধিক পরিমাণেই 'বিমূঢ়'!

শ্রেষ্ঠ শিশুচলচ্চিত্রের পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পেয়েছে 'হট্টগোল বিজয়'। একটি রূপকথা অবলম্বনে কুড়ি মিনিটের এই রঙীন পাপেট ছবিটি বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তোলা হয়েছে। হিন্দি সংস্করণটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে।

বুলু দাশগুপ্ত ও রঘুনাথ গোস্বামী এই শিশুচিত্রের যুগ্ম পরিচালক। বুলু দাশগুপ্ত একজন সুদক্ষ আলোকচিত্রী। রঘুনাথ গোস্বামী তরুণ ও প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ইতিপূর্বে পুতুলনাচের প্রদর্শন ও এতৎবিষয়ে বিভিন্ন প্রয়াসের জন্য রঘুনাথ গোস্বামী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের শিশুচলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গেও তিনি যুক্ত।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও দর্শনের উভয়বিধ ক্ষেত্রে একদা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, শিশু-চলচ্চিত্রের উৎসবও সেই একই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন। এঁদের এই তাৎপর্যময় উদ্যোগকে আমরা অভিনন্দন জানাই। গত শিশুচলচ্চিত্র উৎসবে গণতান্ত্রিক জার্মানীর বেশ কয়েকটি হ্রস্ব ও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাপেট চিত্র দেখানো হয়েছে। পীপলস সীনে সোসাইটি যদিও তাঁদের ঘোষিত বিশেষ কর্মপ্রয়াসের প্রায় কিছুই কাজে পরিণত করতে পারেন নি, তথাপি মাস দুই আগে অনুষ্ঠিত তাঁদের শেষ প্রদর্শনীতে পূর্ব জার্মানীর একটি রঙীন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাপেট চিত্র দেখিয়ে তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আজকাল বাংলাদেশে

অনেকগুলি অপেশাদার তরুণ চলচ্চিত্র-ইউনিটের নাম শোনা যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজেও তাঁরা হাত দিয়েছেন। এঁরা এবং ফিল্ম সোসাইটিগুলি শিশুচলচ্চিত্র উৎসব সমিতির সঙ্গে একযোগে যদি শিশুচিত্র বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হন তাহলে দেশবাসী কৃতজ্ঞ হবেন।

এই প্রসঙ্গে 'বীরসা এ্যাণ্ড দি ম্যাজিক ডল' নামে সেই অসামান্য ছবিটির কথা মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। অবশ্য দ্বিতীয় ছবিটি কোনো কোনো অংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যহীন, তবু পরিচালকের অসীম কল্পনাশক্তি ও পরিচালননৈপুণ্যের সাক্ষ্যবহ। তারপর 'মানিক'। অবশ্য চলচ্চিত্র পরিচালনায় শম্ভু মিত্র বরাবরই নিতান্ত মাঝারি বা অসার্থক। সুতরাং এ প্রসঙ্গে 'মানিক'-এর মতো অভাবনীয়রূপে ব্যর্থ ছবির উল্লেখ না করাই বোধহয় সঙ্গত।

রেনেসাঁস ফিল্ম নামে একটি নতুন ইউনিট 'ঢেউ-এর পরে ঢেউ' তুলেছেন। এটি অচিরে মুক্তিলাভ করবে। যুগ্ম পরিচালক ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহঠাকুরতা। সান্যাল মহাশয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রশিল্পী ও গুণীজন। 'বীরসা এ্যাণ্ড দি ম্যাজিক ডল' ইউনিটের কেউ কেউও নাকি রেনেসাঁস ফিল্ম-এর বর্তমান প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। সুর দিয়েছেন রবিশঙ্কর। সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি শিশু অভিনেতা-অভিনেত্রী এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। এই চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে দেশবাসীর মতো আমরাও আগ্রহী।

শিশু-কিশোর উপযোগী চলচ্চিত্রের এই সামগ্রিক পটভূমিতেই মনে প্রশ্ন জাগে 'পথের পাঁচালী'র দেশে 'হোয়াইট স্ট্যালিয়ন'-এর মতো চিত্র কবে উঠবে? কবে পাপেট ফিল্ম নির্মাণে আমরা পরিমাণ ও গুণগত দিকে বিদেশের সঙ্গে এক মাটিতে দাঁড়াতে পারব? সেই দিনও যে সমাগত তার লক্ষণ মেলে 'হট্টগোল বিজয়'-এর মতো নবীন ও সৎ উদ্যোগে। তাই তার সাফল্যকে আমরা বারবার অভিনন্দন জানাই। বলাই বাহুল্য বুলু দাশগুপ্ত ও রঘুনাথ গোস্বামীর পরবর্তী প্রয়াস সম্পর্কে আরো অনেকের মতো আমরাও এখন থেকে কৌতূহলী থাকব।

স্বাধীনতার পক্ষে

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা সিকেরাস আজও স্পেনের কারাগৃহে অবরুদ্ধ।

জোসে ওরজ্কো, দিয়েগো রিভেরা এবং ডেভিড আলফেরো সিকেরাস—বিশ্ববন্দিত এই তিন মেক্সিকান শিল্পী মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পধারা সম্পর্কে বহিঃপৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সিকেরাস তাঁর চারিত্র্য ও ব্যক্তিক ভূমিকার কারণে আজ প্রায় ইতিহাস

তিনশো বছরের পরাধীনতা ও দেড়শো বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মেক্সিকোর জাতীয় চরিত্রে এক অপরিসীম বৈশিষ্ট্য এনেছে। ভীলা, জুয়ারেজ এই মুক্তি আন্দোলনের নায়ক, যাঁরা আজ প্রায় কিম্বদন্তীতে পরিণত। এঁদেরই সঙ্গে উচ্চারিত হয় সিকেরাসের নাম। ইওরোপ তাঁর সম্পর্কে বলে "মেক্সিকান ক্যারেকটার"। এইভাবে তাদের শ্রদ্ধা জানায়।

ওরজ্কো ও দিয়েগো রিভেরার মতো সিকেরাস প্যারিস শহরে চিত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মেক্সিকোর মহান্ ইতিহাস ও মহৎ জনসাধারণের আবেগকে ছবিতে পরিস্ফুট করার জন্য শুরু হয় তাঁর এক অভিনব ভূমিকা। ১৯২০-র দশকেই চিত্র-ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বিবিধ শিল্পীকে একত্র করে তিনি একটি 'সিণ্ডিকেট' প্রতিষ্ঠিত করেন। দিয়েগো রিভেরা তার সভ্য হন। ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে চিত্রশিল্পকে মুক্তিদান ও জনমানসের সঙ্গে তার রুচিসম্পন্ন সংযোগসাধন তখন সিকেরাসের লক্ষ্য। পেইন্টিং ও আকিটেকচারের মৌলিকশিল্পগুণকে পার্বতী পরমেশ্বরের মতো মেলানোই তাঁর সাধনা। নিজের শিল্পকর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "After repudiating the anti-realistic art of Paris, the intellectual metropolis of that time, we took as the basis of our painting *the figurative object style* which is undoubtedly the foundation of all realistic painting. In the final analysis this led to the growth of national consciousness, *since there is no art of universal significance without national art.*"…(ইটালিকস লেখকের)।

"জনগণের জন্য শিল্প" মেক্সিকোর শিল্পজগতে এই রণধ্বনির অন্যতম প্রবক্তা সিকেরাসকে এই কারণেই ফ্রেস্কো পেইন্টিং-এর দিকে সবিশেষ ঝুঁকতে হলো। এবং "জনগণের জন্য শিল্প" এই ধ্বনি তাঁর কাছে নিছক ফাঁকা কথা ছিল না। শিল্প ও জনগণ—উভয়ের প্রতিই অসীম শ্রদ্ধাবান সিকেরাস তাই তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্পীর অপরিসীম উচকপালেপণা আর তথাকথিত গণবাদী শিল্পীর অপরিসীম শিল্পভাবনাহীনতাকে পরিহার করলেন। ফ্রেস্কো পেইন্টিংয়ের জন্য তাঁকে নব রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হলো। সিকেরাসের

অনেক চিত্রের প্রতিলিপি দেখে তাই তো আমাদের নানা কারণে প্রখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী গোইয়ার কথা মনে পড়ে। ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য আর শিল্পের জটিল গভীর পথে সত্যান্বেষণ—এই তো মহৎ শিল্পীর চারিত্র্য।

।শল্প ও শিল্পীর সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে সিকেরাসকে অচিরকালেই দেশের ও জীবনের বিবিধ সমস্যা আক্রমণ করল। বীরের মতো সিকেরাস সেই ভয়াল অন্ধকারের সামনে দাঁড়ালেন। আর তারই ফলে ভীলা, জুয়ারেজের মতো তিনিও এক কিম্বদন্তীর নায়ক। তারই ফলে এই আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ আজও কারাকক্ষে বন্দী। তারই ফলে নেরুদার কবিতা, পিকাসোর চিত্র বিশ্বজনকে আহ্বান করে—শিল্পী আজ বন্দী, মানবতা আজ লাঞ্ছিত, যারা 'কমিটেড'—এই সংকট মুহূর্তে তারা আপন দায়িত্ব পালন করুক।

আকাদেমির আমন্ত্রণে সিকেরাস ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কলকাতায়ও। ভারত সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? সতীশ গুজরাল সিকেরাসের ছাত্র, তাঁর ও সহশিল্পীদের কি কিছু করণীয় নেই? আমরা, বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা সহজেই শিল্প ও শিল্পীর স্বাধীনতার দাবিতে চিঠি লিখি, বিবৃতি দিই—আমাদেরও কি কিছু করার নেই?

অচিরে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন ও পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব শুরু হবে। সম্মেলন ও উৎসবের সমারোহের মধ্যে একবারও কি আমাদের মনে পড়বে না এক বৃদ্ধ, অক্লান্ত মুক্তি যোদ্ধা, অবিস্মরণীয় শিল্পী কারাকক্ষে লাঞ্ছিত হচ্ছেন? বাঙলা দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা কি একযোগে জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বাধ্য করতে পারেন না? অন্তত যে নৈতিক চাপ এতে সৃষ্টি হবে, দূর দেশে তা-ই হয়তো মুরুব্বীসহ মেক্সিকোর সরকারকে ভীত, অসহায় করতে পারে। সিকেরাসের কাছেও তা হবে প্রেরণা।

এক অঙ্গে এত রূপ

খেলাধূলা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও শরীরচর্চা আর কলা-চর্চাকে খানিকটা পৃথক রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। সে কারণে সংস্কৃতি-সংবাদ বিভাগে খেলাধূলা বিষয়ে কলম ধরার সাহস ইতিপূর্বে হয় নি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অনায়াসে যা সাজে, আমাকে যে তা মানায় না—এ বিষয়ে মনে কোনো দিনই সংশয় ছিল না।

এমতাবস্থায় আমাদের মতো সাধারণ দরের সংস্কৃতিবাদীদের অভয় দিতে বঙ্গদেশে এক সব্যসাচীর আবির্ভাব, প্রায় সেই বিখ্যাত রোমাঞ্চ সিরিজের মোহন-নায়কের মতোই। ক্রীড়ার সঙ্গে কলা মিলিয়ে তিনি আমাকেও এ বিষয়ে কলম ধরতে সাহসী করেছেন। আর অধিকারীভেদের প্রশ্ন নেই।

প্রদেশ কংগ্রেসপাল রাজনীতিতে পোক্ত, এ-কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সংস্কৃতিও যে তাঁর আসে তার প্রমাণ মিলল সেদিন, গঙ্গাটিকুরি সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যেদিন তাঁকে ভাষণ দান করতে দেখা গেল। তারপরও যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা ঘোচালেন সেই প্রায় বটতলার সাহিত্যের তুল্য জনপ্রিয় দৈনিকটি। নির্বাচনের সময় প্রার্থীপরিচিতিতে জানা গেল প্রদেশপাল এক অদ্বিতীয় সাংবাদিক ও সফল সাহিত্যিকও বটেন। "সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক" এবং ছাপার হরফকে বিশ্বাস করার কুসংস্কার আমারও আছে। সুতরাং আর দ্বিধা রইল না।

তারপর দেখা গেল প্রদেশপাল শুধু অদ্বিতীয় রাজনীতিক আর অসামান্য সংবাদ-সাহিত্য-শিল্পীই নন, তিনি যাদু বিদ্যায়ও কলির অবতার। এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বিধানচন্দ্র বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ম্যাজিকে বিশ্বাসী। তাঁর এই বিশ্বাস প্রবল হয়েছে বিহার কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপালের ভানুমতীর খেল দেখে, যার সমাপ্তিতে বাচ্চালোগ ঠিকই তালি বাজিয়েছে। টোটেম ও ট্যাবুর প্রকোপ কেন পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ এক রাজনীতিক মহলে প্রবল, এতদিনে তা বোঝা গেল।

কিন্তু আরও আছে। দুর্ধর্ষ সেবা-দলের অধিপতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রদেশপাল এইবার আই. এফ. এ.-র সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এতদিনে বৃত্ত সুসম্পূর্ণ করলেন।

মাভৈঃ। আর সংস্কৃতিতে ও ক্রীড়ায় ও রাজনীতিতে ভেদ রইল না। প্রদেশপালের বাঁশরী লীলায় গঙ্গা-যমুনা এক হয়ে গেল। দেশবন্ধুর আসনে কংগ্রেসে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আসনে সাংবাদিকতায় ও গোষ্ঠপালের সঙ্গে ক্রীড়াজগতে অধিষ্ঠিত এই যে প্রদেশপাল; এক অঙ্গে এত যাঁর রূপ; হিটলারের মতো বজ্রকঠোর সেই সেবাদল অধিপতি সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দিন, গোয়েবল্‌স্‌-এর মতো প্রচারকুশলী সেই সাংবাদিক চূড়ামণি ক্রীড়াঙ্গনে সভাপতিত্ব করুন, মুসোলিনির মতো দৈব-প্রেরিত পুরুষ রূপে ট্যাবু ও টোটেমে দেশের রাজনৈতিক আকাশ ম্যাজিকে ভরিয়ে দিন।

আমরা হাততালি দিচ্ছি, হাততালি দেব, দিতেই থাকব।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ মাসে বর্ধিত কলেবরে নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে

বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও সুমুদ্রিত

সম্ভাব্য লেখকসূচী

॥ প্রবন্ধ ॥

সত্যেন বসু। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। বিষ্ণু দে। সরোজ আচার্য। পুলিনবিহারী সেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সুনীল সেন। নেপাল মজুমদার। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোক রুদ্র। জীবেন্দ্র সিংহরায়। গোপাল হালদার ও আরও অনেকে ॥

॥ কবিতা ॥

অরুণ মিত্র। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মণীন্দ্র রায়। গোলাম কুদ্দুস। চিত্ত ঘোষ। সিদ্ধেশ্বর সেন। মৃগাঙ্ক রায়। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল। তুষার চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে ॥

॥ কাব্যনাট্য ॥

রাম বসু

॥ গল্প ॥

সমরেশ বসু। অমল দাশগুপ্ত। সত্য গুপ্ত। দেবেশ রায়। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। চার্লি চ্যাপলিন ও আরও অনেকে ॥

॥ উপন্যাস ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ রিপোর্টাজ ॥

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সরস ও ব্যঙ্গ রচনা ॥

হিরণকুমার সান্যাল। সোমনাথ লাহিড়ী

॥ চলচ্চিত্র ॥

'এ্যাসেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস্' বিষয়ে আলোচনা
মৃণাল সেন

- সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত অভিনব প্রচ্ছদ
- খ্যাতনামা শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি



সূ চী প ত্র

নববর্ষ সংখ্যা

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

চিত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্কেচ : গোপাল ঘোষ

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।